কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট্ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তক

১৫৬ খানি চিত্র সম্বলিত

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

১৩৪৬ সাল

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মিত্র এম্-এ কর্ত্তৃক
ভিনাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রেসে মুদ্রিত
৫২-৭ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীআরাধ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[মূল্য ৬৲ টাকা।

উৎসর্গ-পত্র

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডি-লিট্, বার্-এ্যাট্-ল।

বন্ধু!

তুমি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপশিল্পের অনুশীলনের প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া জ্ঞানের এক নূতন দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছ। "চিত্র বিজ্ঞান" তোমার হস্তে সাদরে সমর্পিত হইল। তোমার চেষ্টা জয়-যুক্ত হউক।

গ্রন্থকার।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৯।

১লা বৈশাখ, ১৩৪৬।

২নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড,

কলিকাতা।

চিত্র-বিজ্ঞান।

সূচী-পত্র।

দ্রষ্টব্য।

১৯৪০ সালে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার রূপ-বিদ্যার শাখায় উৎসাহ দানের জন্য শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় নিম্নলিখিত পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন:—

প্রথম পুরস্কার:—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্ণ-পদক।

দ্বিতীয় পুরস্কার: "কমলা-পুরস্কার," শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে সচিত্র পুস্তক।

তৃতীয় পুরস্কার: ওস্তাদ-শিল্পীদের কয়েকটী চিত্রের প্রতিলিপি।

শ্রীযুক্ত রতনমোহন চট্টোপাধ্যায় "সুনয়নী দেবী" পদক পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

চিত্র-বিজ্ঞান

[SCIENCE OF PICTURE-MAKING.]

চিত্র কাহাকে বলে ?

প্রথমতঃ, যাহা দেখিয়া চোখের তৃপ্তি হয়, সেই দৃষ্টি-মধুর সামগ্রীর নাম চিত্র।

দ্বিতীয়তঃ, যাহার দ্বারা চিত্তের বা মনের তৃপ্তি বা আনন্দ হয় তাহার নাম চিত্র।

প্রথমে চোখের তৃপ্তি কিসে হয় এবং কেন হয় তাহার বিচার করিব।

নানা বিভিন্ন রীতির রেখার দ্বারা প্রকৃতির নানা রূপের আকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই রেখার মধ্যে দুইটী প্রধান—

১। সরল রেখা—সোজা লাইন। (চিত্র নং ১)

২। বক্র রেখা—বাঁকা লাইন। (চিত্র নং ২)

প্রধানতঃ, এই দুই রীতির রেখার নানা সমাবেশে প্রকৃতির আকৃতির নানা বিভিন্ন রূপের নানা ছবি লিখিত হইয়াছে (চিত্র নং ৩)। প্রকৃতির আকৃতির নানা রূপের উপর আমরা চোখ বুলাইয়া তাহার বিভিন্ন রূপ কেমন তাহা আমরা অনুভব করি। কোনও কোনও রূপ সরল রেখা প্রধান, যেমন সাধারণ পাহাড়ের রূপ (চিত্র নং ৪)। কোন কোন রূপ বক্র রেখা প্রধান, যেমন গাছের পাতা (চিত্র নং ৫)। সাধারণতঃ, সরল ও বাঁকা রেখার নানা মিশ্রণে প্রকৃতির রূপ নির্ম্মিত হইয়াছে (চিত্র নং ৩)।

১
২
৩
৪
৫
৫
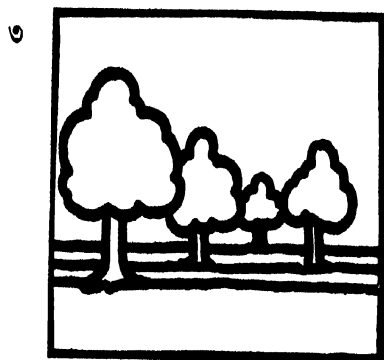
কোনও রেখার উপর চোখ বুলাইতে হইলে, আমাদের চোখের তারা নাড়াইতে হয়—তারার দুই পাশের মাংস-পেশীর (ciliary muscle) সাহায্যে আমরা তারা নাড়াইতে পারি (চিত্র নং ৬)। সরল রেখার উপর চোখ বুলাইলে—এই মাংসপেশী সমান ভাবে নাড়া পায়—তারাকে উচু নিচু করিতে হয় না। বাঁকা রেখার উপর চোখ বুলাইতে হইলে (চিত্র নং ৭) চোখের তারাকে মাংস-পেশী একবার একদিকে ঠেলে—এবং একটু পরেই অন্য দিকে ঠেলে (চিত্র নং ৮)। এই দুই রকমের তারার গতিতে, এক দিকের মাংস-পেশী কাজ করিতে থাকে, তখন অন্য দিকের মাংস-পেশী বিশ্রাম পায়। এই জন্য গোলাকৃতি বা বাঁকা রেখার আঁকা মূর্ত্তির উপর চোখ বুলাইতে কোনও কষ্ট হয় না, উপরন্তু চোখের বেশ আরাম হয়—কেন না পালা করিয়া—মাংস-পেশী বিশ্রাম পায় (চিত্র নং ৯)। অতি দীর্ঘ সরল বা সোজা রেখার উপর চোখ বুলাইতে চোখের কিছু অবসাদ আসে—কারণ মাংস-পেশীকে একই রকম পরিশ্রম অনেকক্ষণ করিতে হয়। পক্ষান্তরে বাঁকা রেখার উপর চোখ বুলাইতে বিভিন্ন পেশীর ক্রিয়া হয় বলিয়া অবসাদ আসে না, বা পরিশ্রম হয় না। পক্ষান্তরে, উচু নিচু সরল রেখার নির্ম্মিত আঁকা-বাঁকা লাইনের (zig-zag line) সংযুক্ত রেখার উপর যদি চোখ বুলাই, তাহা হইলে—চোখের তারা, রেখার এক এক কোণে বাধা পায়—এবং মাংসপেশীকে মাঝে মাঝে উল্টা পথে চোখের তারাকে ঠেলিতে হয় (চিত্র নং ১০)। সুতরাং অবিচ্ছিন্ন সরল রেখার উপর চোখ বুলাইলে আমরা চোখে যে সুখ অনুভব করি, আঁকা-বাঁকা (zig-zag) রেখার উপর আমাদের চোখ সে সুখ অনুভব করিতে পারে না। পদে পদে বাধা পাইয়া এবং বিপরীত পথে চলিবার তাগীদে চক্ষু পীড়া পায়। অথচ যদি এই দ্বিভূজ সরল রেখার খোঁচা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় (চিত্র নং ১১)—এবং আঁকা-বাঁকা লাইনকে (zig-zag line) উঁচু-নীচু

সিলিয়ারী পেশী।
সিলিয়ারী সার।

৮

৭
৯

১২

১০
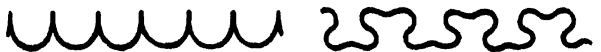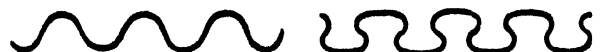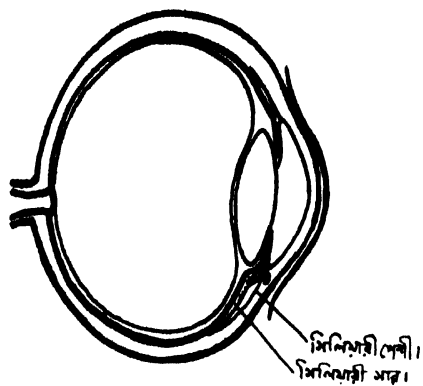
১১

বাঁকা রেখার মালাতে পরিণত করা যায়,—এই বাঁকা রেখার ছন্দের উপর চোখ বুলাইলে— চোখের কোনও কষ্ট হয় না উপরন্তু বেশ আরাম বোধ হয়, যদিও এই উঁচু নীচুর বিপরীত গতিতে চোখ দোলা পায় বটে, কিন্তু মাংস-পেশী খোঁচা খোঁচা রেখার হঠাৎ বাধা পায় না। গতির ক্রমভঙ্গে মাংসপেশী আস্তে আস্তে ছাড়া পায়। আঁকা-বাঁকা লাইনের (zig-zag line) মত হঠাৎ আছাড় খাইয়া পড়ে না। ১১ ও ১২ নং চিত্রের নক্সাগুলির উপর চোখ বুলাইলে কথাটা বোঝা যাইবে।

এই বাঁকা রেখার উঁচু নীচুর দোলাকে ইংরাজী ভাষায় Rhythm বা ছন্দ-গতি বলে। কেবলমাত্র সোজা সরল রেখার সাহায্যে চিত্রকর চক্ষুর প্রীতিকর সুন্দর চিত্র লিখিতে পারেন বটে, কিন্তু, বাঁকা রেখার সাহায্য না লইলে সুমধুর ছন্দে চিত্র রচনা করিতে পারা যায় না। কারণ আমরা দেখিয়াছি যে সোজা রেখার খোঁচা বা এক রীতির গতি আমাদের চক্ষু পীড়িত করে। মাঝে মাঝে বাঁকা রেখার আশ্রয় না পাইলে চোখের সুখ হয় না। সোজা লাইনে আঁকা মানুষের ছবিটী গোল রেখায় আঁকা নীচের ছবিটীর সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাই, যে বাঁকা রেখায় গড়া মানুষের ছবিটী দেখিতে মিষ্ট লাগে (চিত্র নং ১৩ ও ১৪)। খাড়া লাইনের খোঁচায় এই মধুর মিষ্ট রসটী নাই (চিত্র নং ১৩)। ঘোড়ার দুটী ছবিতেও এই তফাৎ বেশ বোঝা যায় (চিত্র নং ১৫, ১৬)। সোজা লাইনে গড়া মোরগের লড়াই (চিত্র নং ১৭) এবং মোলায়েম বাঁকা রেখায় লেখা 'ইঁদুরের দৌড়' (চিত্র নং ১৮) দুটী চিত্রে, এই বিভিন্ন জাতির রেখার বিভিন্ন রসের পার্থক্য বেশ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছি।

সরল রেখার চতুষ্কোণের কোণা ভাঙ্গিয়া দিলে এবং গোলাকৃতি করিলে, চতুষ্কোণ বস্তু গোলাকৃতির বাঁকা রেখার মাধুর্য্য লাভ করে (চিত্র নং ১৯, ২০)।

১৩

১৫

১৭

১৪

১৬

১৯

২০

১৮
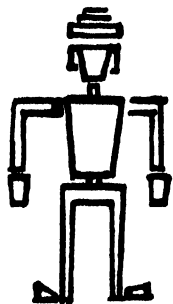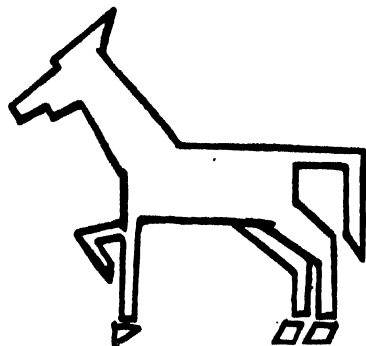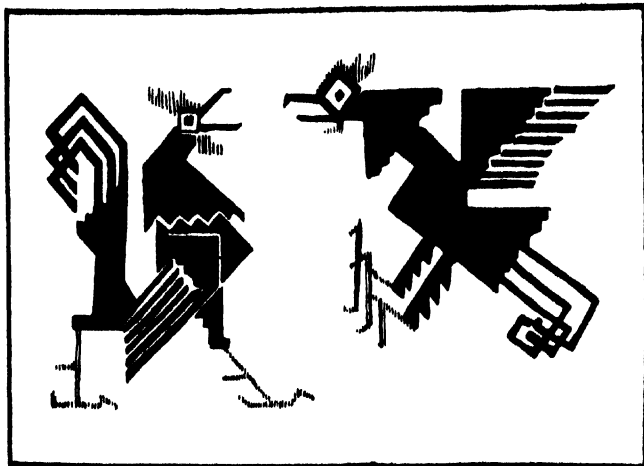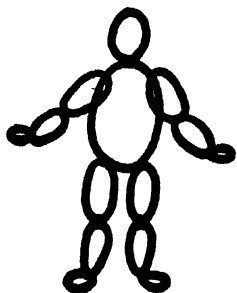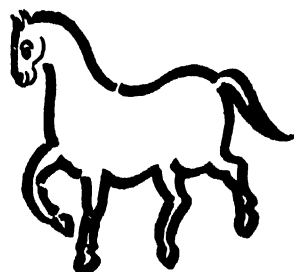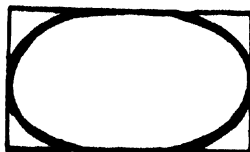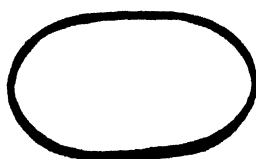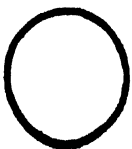
প্রকৃতি দেবী তাঁহার পদ্ম-হস্ত বুলাইয়া সমস্ত সরল রেখার কোণ ভাঙ্গিয়া গোলাকৃতির বাঁকা রেখার মাধুর্য্যে প্রকৃতির নানা মূর্ত্তিকে মধুর করিয়া তুলিতেছেন। প্রকৃতির রূপে কদাচিৎ চোখের পক্ষে দৃষ্টি-কটু কোণ দেখা যায় (চিত্র নং ২১)। পাহাড়ের শিখর-দেশ কতকটা কোণাকৃতি হইলেও বাঁকা রেখার সংযোগে সরল রেখার কোণ গোলাকার ধারণ করে (চিত্র নং ২২)।

সরল ও বাঁকা রেখার দোষ গুণ ও মূল্য বিচার করিয়া, বিচক্ষণ চিত্রকর তাঁহার রেখা সমাবেশের মধুচক্র রচনা করেন। কবি যেমন নানা অক্ষরের নানা ওজনের শব্দ চয়ন করিয়া—যথাযোগ্য সমাবেশ করিয়া, ছন্দে ও তালে সংযুক্ত করিয়া সুমধুর কবিতা রচনা করেন, সেইরূপে চিত্রকর নানা রূপের, নানা মূল্যের, নানা ওজনের, নানা ছন্দের রেখার সুমিষ্ট সমাহার বা সন্নিবেশ (composition) করিয়া চক্ষুর প্রীতিকর সুমধুর চিত্র রচনা করেন (চিত্র নং ২৩, ২৪)।

এই রেখা সমাবেশের রীতি চিত্রকর নিজে উদ্ভাবন করেন। স্বভাবের রূপ সমাবেশের হুবহু নকল করেন না। এই নিজের উদ্ভাবিত রেখার সমাবেশ বা সংস্থান চিত্রকরের নিজস্ব মৌলিক রচনা, নক্‌সা, বা ডিজাইন। এই ডিজাইন বা স্বেচ্ছাকৃত রেখার সমাবেশ চিত্র-রচনার মূল শক্তি বা প্রাণ (চিত্র নং ২৫)।

সরল রেখা ও বাঁকা রেখার মধ্যে যদিও একটা প্রকৃতিগত বিভেদ বা বিবাদের সম্পর্ক আছে। এই বিভিন্ন ও বিবাদী রস অবলম্বন করিয়া, এক জাতীয় রেখা অন্য জাতীয় রেখার শক্তিসংযোগ বা পোষকতা করে। যেমন কাল রঙের পাশে সাদা রঙ্ অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, তেমনি, বাঁকা রেখার পাশে—বা নিকটে সরল রেখা অধিক সরল বা সোজা বলে মনে হয়। তেমনই সরল রেখার পাশে—বাঁকা রেখা অধিকতর গোলাকৃতি মনে হয় (চিত্র নং ২৬)।

২২
২৪
২৫
৬
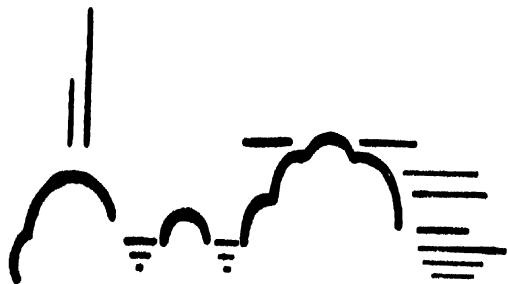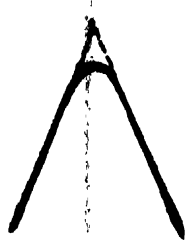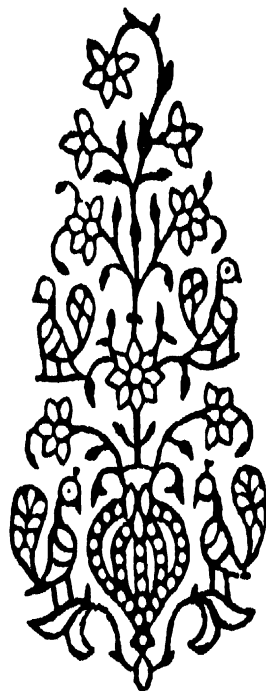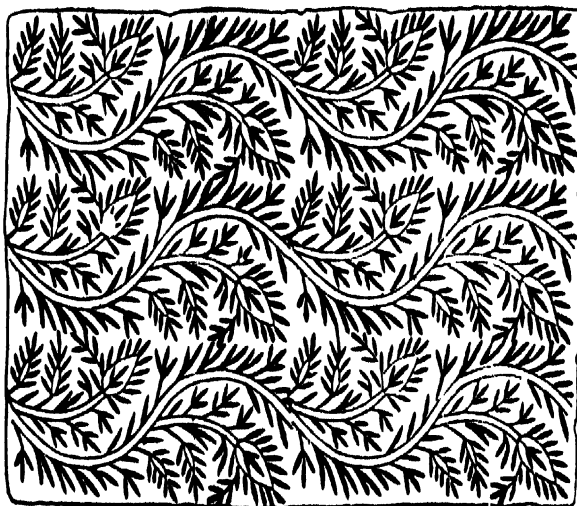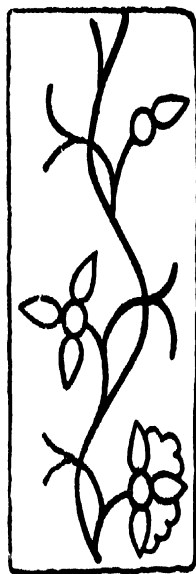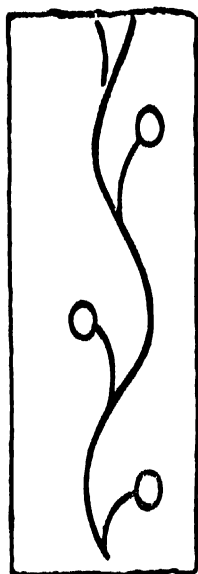
এই জন্য কোনও রেখাকে শক্তিশালী কিম্বা গুরুত্বের ওজন দিতে হইলে—তাহা দুইটী উপায় বা পদ্ধতিতে করা যাইতে পারে। প্রথম পদ্ধতি, বিপরীত রসের বা বিবাদী রেখার সাহায্য গ্রহণ। দ্বিতীয় পদ্ধতি, একই রসের অথবা বাদী রেখার সাহায্য গ্রহণ। একটী সরল রেখার পাশে কিম্বা নিকটে যদি আরও কয়েকটী সরল রেখা পাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ রেখার পোষকতা করা হয়, তাহার গুণ বাড়ে—তাহার ওজন বাড়ে—তাহা রসে ভারী হয় (চিত্র নং ২৭)। এই রেখার পৌনঃপুন্যে বা দ্বিত্বে রেখার নূতন মূল্য বা রসের উদ্ভব হয়। অনেক সময়ে—এই সহকারী বা বাদা রেখাকে অতি নিকটে কিম্বা কিছু দূরে বা বহু দূরে রাখিতে হয় (চিত্র নং ২৮)—এই দূরত্বের বা সান্নিধ্যের পরিমাণ অনুসারে এই সহকারিতার সাহায্যের তারতম্য হয় এবং মূল রেখার রসের গুরুত্বের বা ওজনের বেশী কম হয়। চিত্রকরের উদ্দেশ্য অনুসারে, এই সমবাদী বা সাহায্যকারী রেখাকে দূরে বসাইতে হয়, কিম্বা নিকটে আনিতে হয়। এই দূরত্ব ও সান্নিধ্যের পরিমাণ অনুসারে রেখার ওজনের বা রসের অনুভূতির তারতম্য ঘটে।

চিত্রকরের উদ্দেশ্য অনুসারে সরল রেখা, বক্র রেখা, কোণযুক্ত সরল রেখার মালা কিম্বা বক্র রেখার মালার সংযোগ করিয়া, চিত্রকর তাহার মনোনীত নক্সা বা রেখার-সমাহার (ডিজাইন) গড়িয়া তোলেন (চিত্র নং ২৯)।

আহারের ব্যঞ্জনে অধিক লবণ-সংযুক্ত হইলে যেমন কিছু চিনি সংযোগে তাহার কটুতার দোষ ক্ষালন করিয়া লওয়া হয়, সেইরূপ যেখানে অতি মাত্রায় বাঁকা রেখার সমাবেশ আবশ্যক হইয়াছে, তাহার দোষ ক্ষালনের জন্য চিত্রকর—নিকটে সরল রেখার সমাবেশ করেন (চিত্র নং ৩০)। পক্ষান্তরে, যেখানে অধিক পরিমাণে সরল রেখার সমাবেশের আবশ্যক হইয়াছে,

২৭
২৮

২৯

৩০
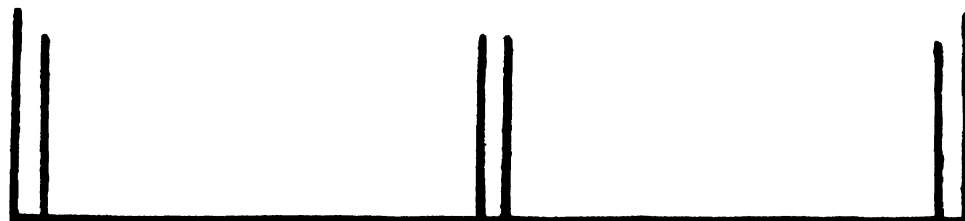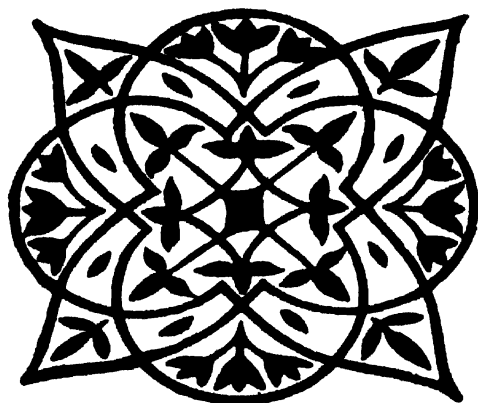
তাহার দোষ ক্ষালনের জন্য চিত্রকর তাহার রচনার নক্সার (ডিজাইন) মধ্যে কোনও স্থানে কৌশলে বাঁকা রেখার সমাবেশ করিয়া অতিমাত্রায় সরল রেখার সন্নিবেশের দোষ ক্ষালন করিয়া লইতে পারেন। এইরূপে সরল রেখার 'হাঁসিয়া' জুড়িয়া দিয়া, কোণ যুক্ত সরল রেখার সমষ্টির উগ্রতা, বা দৃষ্টি-কটুতা লাঘব করিয়া লইতে পারেন। এইরূপে অনবচ্ছিন্ন এক রসের অবসাদকারী অতি দীর্ঘ সরল রেখাকে ভিন্ন করিয়া, মধ্যে মধ্যে বাঁকা রেখার সংযোজনা করিয়া, চক্ষু-পীড়া নিবারণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের হস্তলিপি-পটু প্রাচীন লেখকদের অক্ষর লিখিবার লিপি-কৌশলে (calligraphy) এই সরল ও বাঁকা রেখার মধুর সামঞ্জস্যের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগে, সুন্দর হস্ত-লিখিত পুঁথীর খুব কদর ছিল। রাজা, বাদশাহ, খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম-যাজক, ও পুরোহিত এবং ধর্ম্ম-প্রাণ মুসলমান সাধু ও পণ্ডিতগণ লিপি-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ উন্নতি সাধন করিয়া ছিলেন। এই সব ধর্ম্ম-প্রাণ সাধকদের সাহায্যে ও সাধনায়, লিপি-বিদ্যা একটী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্প-বিদ্যায় পরিণত হইয়াছিল। মধ্য যুগের এই সব লিপি-কুশল শিল্পীদের লেখায়— সোজা ও বাঁকা রেখার সুন্দর ও সুকৌশল প্রয়োগ দেখা যায়। যাঁহারা এই সব সুন্দর লিপি লিখিতেন, তাঁহারা রেখা-তত্ত্বে, বিশেষ পারদর্শী ছিলেন— অর্থাৎ কি পরিমাণে সোজা রেখার সহিত বাঁকা রেখা যুক্ত করিলে,—সুন্দর সুমধুর আকৃতির অক্ষর লেখা যায়— তাহার ঠিক মূল্য বা ওজন জ্ঞান তাঁহাদের ছিল। চীন, জাপান ও ভারতবর্ষে এই অক্ষর লিখিবার শিল্পকলার অনেক পরিচয় আছে। এই অক্ষর-লেখার লিপিকলার কয়েকটী উদাহরণ সামনের পাতার চিত্রে দেখান হইয়াছে (চিত্র নং ৩১— ৩৭)। ৩৬ নং চিত্রে, চীনা ভাষার নানা অক্ষর সংযুক্ত করিয়া একটী মানুষের চিত্র রচিত হইয়াছে।

৩১

৩২

من عذب لسانه كثر اخوانه

৩৩

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ

৩৪

৩৭

৩৫

৩৬
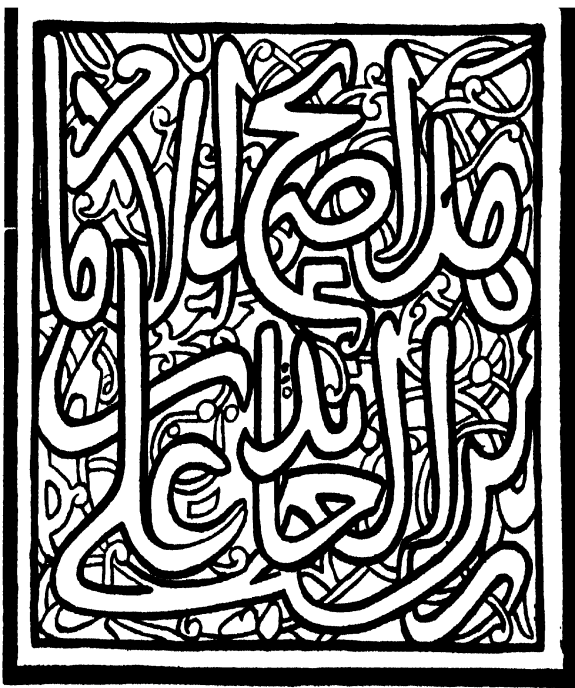
আলঙ্কারিক রীতির নক্সাতে বাঁকা রেখা একবারে বাদ দিয়া, কেবল নিছক সরল রেখার আশ্রয় লইয়া চিত্র রচনা করা যায়। মোরগের লড়াইয়ের চিত্রে (চিত্র নং ১৭) তাহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। রেখা ও রূপের দার্শনিকরা বলেন যে প্রত্যেক সরল রেখার চতুষ্কোণের মধ্যে বাঁকা রেখার গোলাকৃতি নিহিত আছে। সেইরূপ প্রত্যেক বাঁকা রেখার রচনার মধ্যে সরল রেখার চতুষ্কোণ নিহিত আছে (চিত্র নং ৩৮)। এবং একথাও সত্য যে একটী বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া (centre) লিখিত ছোট ছোট সরল রেখার সমষ্টি লইয়াই গোলাকৃতি বৃত্ত বা চক্র (circle) রচিত হয় (চিত্র নং ৩৯)। যে যে গোলকের নেমীদণ্ড (radius) যত বড়, তাহার পরিধির রেখাখণ্ড তত বড়। নেমী-দণ্ড যত. ছোট হয় পরিধির সরল রেখাগুলি তত ছোট হয়। ক্রমশঃ এই রেখাগুলি বিন্দুর আকৃতি ধারণ করে (চিত্র নং ৪০)।

কোন কোন দার্শনিকরা বলিয়া থাকেন যে প্রকৃতির আকৃতিতে কোথাও রেখার অস্তিত্ব নাই—সমস্তই বিন্দু। বস্তুতঃ বিন্দুর সমষ্টি লইয়াই রেখার শরীর গঠিত হয়। এবং এই রেখার অক্ষর অবলম্বন করিয়া চিত্রকর, স্বভাবের রূপের নকল চিত্র, কিম্বা আপনার কল্পনার বলে, নূতন রীতির রসরূপ রচনা করেন। প্রত্যেক চিত্রের মধ্যেই নক্সার ডিজাইন বা রেখা-সন্নিবেশের কৌশল অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। যে রেখার পরিকল্পনার মধ্যে যত শক্তি, মাধুর্য্য, সঙ্গতি, ঐক্যতা ও ঐক্যতানিকতা ও রস প্রকাশের কৌশল যত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান, সেই অনুসারে পরিকল্পনা (ডিজাইন) সার্থক ও ফলপ্রদ হয়। সমঝ্‌দার ও রসবিৎগণের চক্ষে দুর্ব্বল রেখাপাত অপেক্ষা পাকা হাতের জোরাল (strong) রেখাপাতের নক্সা অধিক আদরণীয়। জাপান ও চীনদেশের চিত্রে এবং বৌদ্ধযুগে ভারতের চিত্রে এই রেখাপাতের বলিষ্ঠতা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য (চিত্র নং ৪১, ৪২, ৪৩)।

৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩
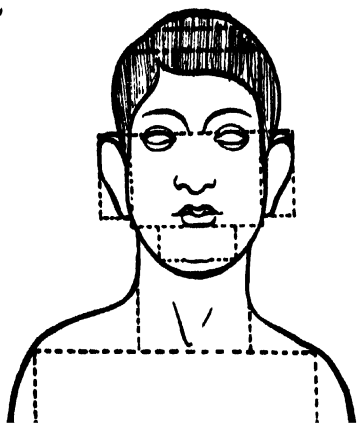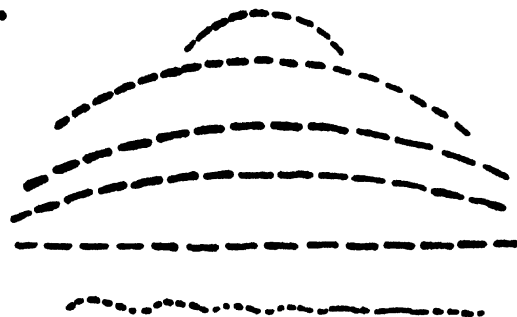
তুলীর এক আঁচড়ে চিত্রের অবয়বের এক এক অংশ চিত্রিত করা পূর্ব্ব দেশের চিত্রকরদের বিশিষ্ট রীতি। তুলীর এই কলম্-বাজী (calligraphy) পূর্ব্ব দেশের চিত্ররীতিকে শক্তি ও বলিষ্ঠতার গুণে গুণবান্ করিয়াছে। স্থূল পরিসরের রেখামাত্রই শক্তিশালী বা বলিষ্ঠ নহে। এবং সূক্ষ্ম তুলিকার ক্ষীণ রেখা মাত্রই দুর্ব্বল রীতির রেখা নহে। মাধুর্য্য বা মিষ্টতা রেখাপাতের আর একটী বাঞ্ছনীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ, বাঁকা রেখার নানা নূতন পরিকল্পনায়, রেখায় মিষ্ট রসের সৃষ্টি হয়। তরলতা বা রেখার সচ্ছন্দগতি রেখাকে সুমিষ্ট করে। সঙ্গতি বা যথাযোগ্যতা রেখা পরিকল্পনার আর একটী বিশিষ্ট গুণ।

যে রস অবলম্বন করিয়া চিত্র লিখিত হইতেছে তাহার অনুরূপ যথাযোগ্য রেখার কল্পনা আবশ্যক। চীন ও জাপান দেশের চিত্রের রেখা-কল্পনায় যথা-যোগ্যতার—অর্থাৎ রসের অনুযায়ী রেখা-সৃষ্টি বা উদ্ভাবনের, বহু দৃষ্টান্ত আছে। ৪৪ নং চিত্রে, 'ধর্ম্ম-ব্যাখানের' হাতের "মুদ্রায়"—এমন একটী রেখা-সৃষ্টির কৌশল আছে, যাহা দেখিলে মনে হয়—হাত যেন "কথা" বলিতেছে। ৪৫ নং চিত্রে, চিবুকের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গোল রেখার নীচে, গ্রীবা দেশের রেখায় সুমধুর প্রতিধ্বনি আছে—এবং তাহার নীচে, উপর্য্যুপরি দুইটী রেখা (কণ্ঠের খাঁজের ত্রিবলী-রেখা)—আর একটী এক রসের গোল-রেখার প্রতিধ্বনি তুলিয়া, এক সুমধুর রসের রেখার ঢেউ তুলিয়াছে। এই বাঁকা রেখার উল্টা জবাব বা প্রতিধ্বনি করিতেছে চোখের রেখা ও ভুরুর গোল রেখা—এবং চুলের নীচে কপালের অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে ছোট ছোট রেখা। এই রেখার পরস্পর প্রতিধ্বনিতে ও সামঞ্জস্যে চিত্রটীকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। লিখিত চিত্রের নানা অঙ্গের ও

89

88
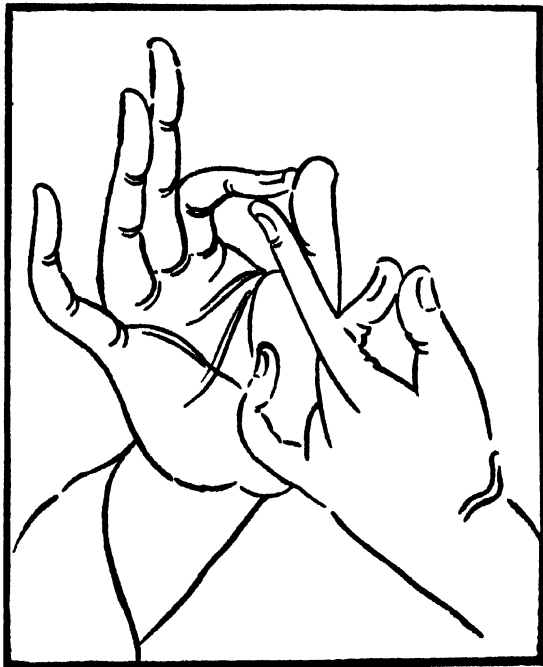
অবয়বের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিন্যাস করা আবশ্যক। একাংশের রেখার সহিত অন্য অংশের রেখার একটা সামঞ্জস্য, মিত্রতা, বা সঙ্গতি রাখা আবশ্যক। নতুবা, চিত্রের এক অংশ অন্য অংশের বিবাদী হইয়া, চিত্রের সামঞ্জস্য, সঙ্গতি, ও ভার-সাম্যতা (balance) নষ্ট করে। এই সঙ্গতির আর একটা দিক্ হ'ল, চিত্রের নানা অংশের ঐক্যতা বা ঐক্যতানিকতা। অর্থাৎ বিভিন্ন রস ও বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ওজনের রেখার সমন্বয় করিয়া, নানা বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী রেখার মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপনা করা, নিপুণ চিত্রকরের কর্ত্তব্য। এক এক খণ্ড অংশকে সন্নিবেশের কৌশলে, অখণ্ড ও এক করিয়া তোলা ওস্তাদ শিল্পীর উদ্দেশ্য। রেখার শ্রেষ্ঠ গুণ হ'ল—প্রকাশের কুশলতা। যে কথা বলিবার উদ্দেশ্য, সেই বক্তব্য কথা বা রস স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, এরূপ রেখার স্থাপনা করিতে হইবে। যে রেখার সন্নিবেশে বক্তব্য কথা পরিস্ফুট হয় না, সে রকম রেখাপাতের কোনও মূল্য নাই। চিত্ররেখার প্রকাশ গুণ তাহার বিশেষ বাঞ্ছনীয় গুণ। প্রত্যেক চিত্রে তাহার রেখার কাঠামটী (structure) তাহার গুণ-বিচারের অপরিহার্য্য অংশ।

পশ্চিম দেশের চিত্র-শিল্পে আলো ও ছায়াপাতের আবশ্যকতায় এবং নানাভাবের কল্পিত বর্ণ-সমাবেশে, তাহাদের চিত্রের ভিতরকার রেখার কাঠামটী অনেক সময় চাপা পড়িয়া যায়, হঠাৎ নজরে ঠেকে না। আলো ও ছায়ার ও নানা বর্ণের আবরণ ভেদ করিয়া, তাহার ভিতরের কাঠামটী উদ্ধার করিয়া, তাহার বস্তু-সমাবেশের ও রেখা-রচনার (composition) গুণ বিচার করিতে হয়।

এইরূপে চিত্র বিশ্লেষণ করিয়া, পশ্চিম-দেশের চিত্রের রেখার কাঠাম বিচার করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে ভিন্ন ভিন্ন চিত্রে, পশ্চিম-দেশের চিত্রকর বিভিন্ন পদ্ধতির রেখা সমাহারের পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কখনও সরল রেখা অবলম্বন করিয়া, কখনও বাঁকা

রেখার আশ্রয় লইয়া, কখনও চক্রাকৃতি, কখনও ডিম্বাকৃতি, কখনও কোণাকৃতি নানা বিভিন্ন জাতির রেখার পরিকল্পনার মধ্য দিয়া পশ্চিম দেশের ওস্তাদ শিল্পীরা নানা বিভিন্ন রস ও বিভিন্ন ভাবের চিত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া আমরা তাহাদের রচনা পদ্ধতির নানা কৌশল ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাই।

পূর্ব্ব-দেশের চিত্রে, চিত্রের বনিয়াদ্ মূল কাঠামটী আলো ও ছায়ার ও বর্ণ সমাবেশের আধিক্যে ঢাকা পড়ে না, সহজেই আসল কাঠামটী চখের সামনেই জেগে থাকে। কয়েকটী পূর্ব্ব দেশের চিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া পূর্ব্ব-দেশীয় রেখা রীতির বৈশিষ্ট্য কি তাহার বিচার করিয়া আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহার পূর্ব্বে, পশ্চিম দেশের কয়েকটী ওস্তাদ শিল্পীর হাতের ছবি আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব।

প্রথম উদাহরণ (৪৭)

পুভি দে সাবানের লিখিত "সেন্ট জেনেভীবের" চিত্র। চিত্রটীর ভিতরের কাঠামটী কেবলমাত্র কয়েকটী দণ্ডায়মাণ (perpendicular) ও শায়িত (horizontal) সরল রেখার সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। কোথাও কোনও বাঁকা রেখা নাই বলিলেও হয়। কেবল আকাশের গোলাকৃতির চাঁদের মূর্ত্তি ছাড়া, আর কোথাও বাঁকা রেখার কোনও চিহ্নই আমাদের চোখে পড়ে না। যেখানে স্থিতির ভাব, গতির অভাবের রূপ, বা শান্তিরসের প্রকাশ করা শিল্পীর উদ্দেশ্য, সেখানে শিল্পীরা প্রায়ই সরল রেখার আশ্রয় লয়েন। সরল রেখা গতিহীনতা বা স্থিরভাব সহজেই প্রকাশ করিতে পারে। সেন্ট জেনেভীব ফ্রান্সের পারী সহরের একজন পরহিত-রতা সন্ন্যাসিনী ছিলেন। মৃত্যুর পরও পারী নগরীর অধিষ্ঠাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী দেবীরূপে তিনি পূজা পাইয়াছেন। নিদ্রিত, স্তব্ধ, পারী নগরীর কল্যাণ-চিন্তার ধ্যানরতা দেবী,— সুপ্ত-নগরীকে চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণের মধ্য দিয়া, যেন তিনি বাক্যহীন শব্দহীন শব্দে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—চিত্রকরের পরিকল্পনাটী এই। সরল রেখার পরিকল্পনার মধ্য দিয়া শান্তি রসের ভাব ও গাম্ভীর্য্যটী সহজেই প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ (৪৮)

হবেমা কর্ত্তৃক চিত্রিত "আভিনিউ" বা বৃক্ষ-শ্রেণী। এই চিত্রটীর কাঠাম চিত্রটী (৪৯) কয়েকটী দণ্ডায়মান রেখায় গঠিত। আর একটী প্রধান চিত্ররচনার নিয়ম চিত্রটীতে দেখান হয়েছে। কোনও চিত্রের কেন্দ্রস্থল (centre of interest) চিত্রটীর মধ্যস্থানে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিৎ নহে—কিছু বাম দিকে, কিম্বা দক্ষিণ দিকে রাখিতে হয়। অর্থাৎ চিত্রটী ঠিক সমান ভাগে বিভক্ত হওয়া উচিৎ নহে। এই চিত্রে ইহার কেন্দ্রস্থল মধ্য বিন্দুর কিছু বাম দিকে। রেখা-রচনার আর একটী নিয়ম চিত্রটীতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানেই একাধিক দাঁড়া রেখার সারি আছে—এই আধিক্যের এক রীতির ঔষধ স্বরূপ, অন্ততঃ দুই একটী শায়িত রেখা (horizontal) প্রয়োগ করিতে হইবে। এখানে দিগন্ত রেখা এবং তাহার সমান্তরালে আর একটী শায়িত রেখার প্রয়োগ আছে।

—এগার—

৪৭

৪৮

৪৯
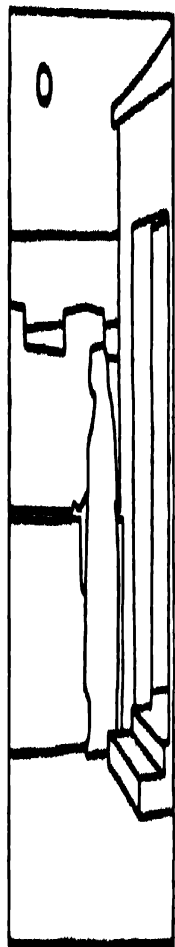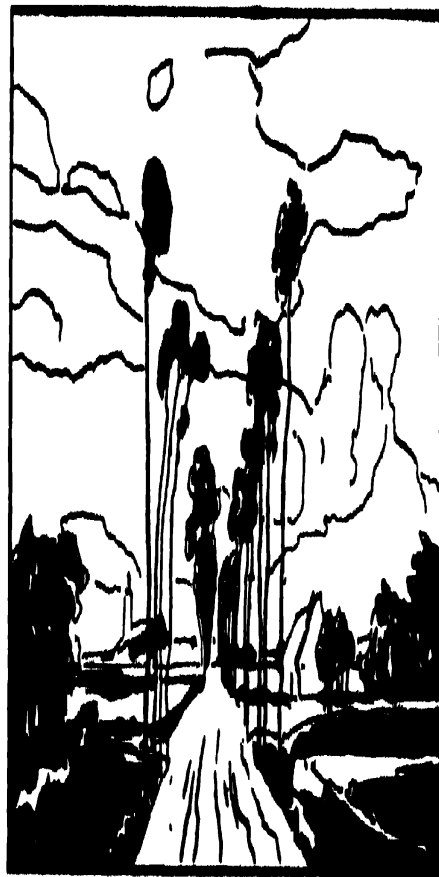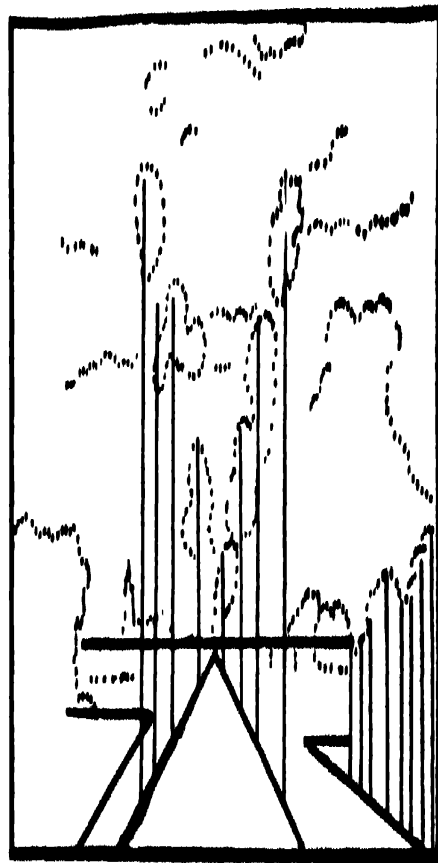
তৃতীয় উদাহরণ (৫০)

'মাদাম্ লেব্রুণ ও তাঁহার কন্যা'।

এই চিত্রের অভ্যন্তর ভাগে (৫১) যদিও বিশেষ কোনও সরল রেখার অবকাশ নাই, ইহার আউট-লাইন বা পরিধি-রেখা দুইটী সরল রেখার যুক্ত কোণ দ্বারা পিরামিডের আকারে কাঠাম রচনার উদ্দেশ্য এই যে, চোখ সর্ব্বাগ্রে কোণের শৃঙ্গের উপর পড়ে, তাহার পর ক্রমে এই ঢালু রেখা অবলম্বন করিয়া নামিয়া আসে। মূর্ত্তি চিত্রকারের প্রধান উদ্দেশ্য এই, যে মানুষের মুখের উপর আগে মন আকর্ষণ করা। অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রকার বেশ ভূষার পারিপাট্যের উপর আগে মনঃসংযোগের চেষ্টা করেন। জগতের বিখ্যাত চিত্রকার রেম্‌ব্রাণ্ট কখনও বেশভূষাকে প্রথম স্থান দেন নাই। হলবান্ ভেলাক্রুয়ে ও অ্যানুগ্রের মূর্ত্তি-চিত্রে,—মুখ ও বেশ-ভূষার উপর সমানভাবে মন আকৃষ্ট হয়। এই রীতির স্বপক্ষে কেহ কেহ বলেন, যে কোন কোন মানুষের পক্ষে তাহার বেশ ভূষা তাহার প্রতিমূর্ত্তির অপরিহার্য্য অংশ, সে ক্ষেত্রে তাহার বেশ ভূষাকে বাদ দিলে, কিম্বা দ্বিতীয় স্থান দিলে, অনেক সময় তাহার মূর্ত্তি চিনিয়া লওয়া কঠিন হয়।

রাফেলের অনেক চিত্র এই পিরামিড রীতির রেখায় রচিত।

চতুর্থ উদাহরণ (৫২)

রাফেলের 'চেয়ারে উপবিষ্ট মাতৃকা-মূর্ত্তি' (Madonna of the Chair)।

এই চিত্রটী কেবল আকারে গোলাকৃতি নহে—ইহার নক্সার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাঁকা রেখার সাহায্যে নিৰ্ম্মিত। এক চেয়ারের হাতল ব্যতিরেকে আর কোথাও সরল রেখার স্থাপনা নাই। যেমন সেণ্ট জেনেভাবের চিত্রে কেবলমাত্র একটী বাঁকা রেখার চন্দ্র আছে—আর সমস্তই সরল রেখায় গঠিত, তেমনই—এই চিত্রে একটীমাত্র সরল রেখা আছে—আর সমস্তই বাঁকা রেখার সমষ্টি।

—যার—

৫০

৫১

৫২
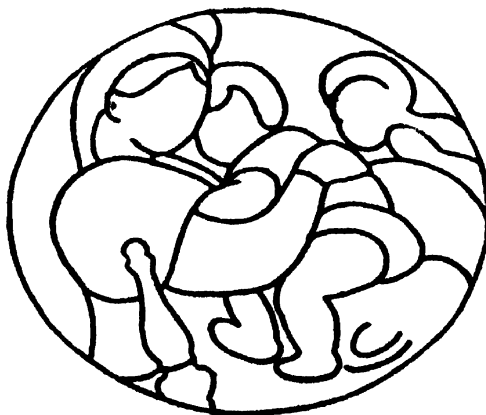
পঞ্চম উদাহরণ (৫৩)

রেম্‌ব্রাণ্টের 'বৃদ্ধার প্রতিকৃতি' (Old Woman)।

এই চিত্রটী গোলাকার রেখার রচনার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মাথার টুপি, গলার কলার এবং মুণ্ডটী—পরস্পরের গোলাকৃতির প্রতিধ্বনি করিতেছে (৫৪)। এই গোলাকৃতি বাঁকা রেখার ধ্বনি প্রতিধ্বনির মধ্যে, কোথাও কোনও সরল রেখাকে স্থান দেওয়া হয় নাই। এই অতি মাত্রার বাকা রেখার সাহায্যে, বৃদ্ধার মূর্ত্তিকে চিত্তহারী ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। চোখের পীড়াদায়ক কিম্বা বাঁকা রেখার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও রেখা এই চিত্রে স্থান পায় নাই।

ষষ্ঠ উদাহরণ (৫৫)

ভেরমীয়র লিখিত 'বালিকার প্রতিকৃতি' (Portrait of a Young Girl).

এই চিত্রে মুণ্ডটী সম্পূর্ণ গোলাকার না হইলেও ডিম্বাকৃতি বাঁকা রেখার সমষ্টি। এখানে মুখের বাঁকা রেখার পরিপোষক রেখা মাথার গোলাকৃতি টুপী, কিন্তু এখানে বাঁকা রেখার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে,—বিবাদী সুরের সরল রেখাযুক্ত টুপীর কাপড়ের ঝালর। বিপরীত রসের এই সরল রেখা বক্র রেখাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে।

সপ্তম উদাহরণ (৫৬)

মিচেল্‌ এঞ্জেলোর 'মানুষের সৃষ্টি' (Creation of Man)

এই জগৎ বিখ্যাত চিত্রের শক্তিশালী পরিকল্পনায় কোথাও সরল রেখা আমাদের চোখে পড়ে না। দুইটী প্রসারিত হাতের সরল রেখার ঋজুত্ব বাঁকা রেখার সংযোজনায় বিভিন্ন হইয়াছে। এবং এই স্পর্শের অজুহাতে চিত্রের দুই বিভিন্ন অংশের স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। ছবিটীর এক কোণে একটু চতুষ্কোণের আলোকিত অংশ আছে কিন্তু অত্যধিক বাঁকা রেখার কলরবে এই চতুষ্কোণ অংশ যেন নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

৫৩

৫৪

৫৫

৫৬

৫৭
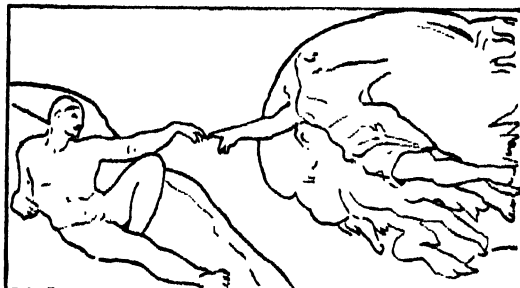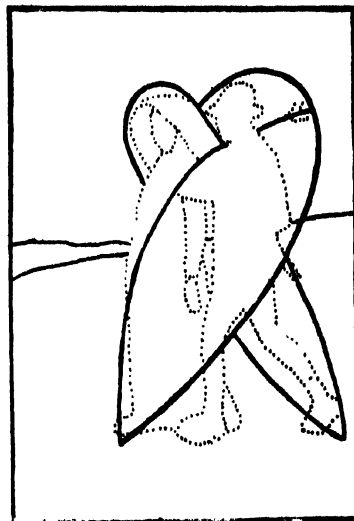
অষ্টম উদাহরণ (৫৭)

জিন্ ফ্রাঁসোয়া মিলের 'কাজে চলেছে' (Going to Work)।

এই বিশ্ববিখ্যাত চিত্রে দুইটী শ্রমিক পাশাপাশি একসঙ্গে গমনের নক্সা গঠিত হইয়াছে। প্রথমে মনে হয় যেন চিত্রকর দুইটী দণ্ডায়মান সরল রেখার নক্সা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যুগলমূর্ত্তি দুইটী যুক্ত চিত্রের রেখা অনুসরণ করিলে দেখিতে পাই যে দুটী বাঁকা রেখায় গঠিত দুটী ডিম্বাকৃতির সমাবেশ। যদি সরল রেখা কোথায় থাকে ত ঐ দিগন্ত রেখার ক্ষীণ রেখায় কিছু কিছু চোখে ঠেকে।

৫৭

রেখার সামঞ্জস্য

[BALANCE]

যখন কোনও চিত্রে রেখা বা বস্তু সমাবেশের বাহুল্যে চিত্র-বস্তু একদিকে ঝুঁকে পড়ে, তাকে ওজনে টেনে তুল্‌বার জন্য অন্যদিকে ভার চাপাতে হয়, অর্থাৎ নূতন বস্তুর সমাবেশ করে তাহার সামঞ্জস্য কর্ত্তে হয়। কথায় বলে, "গরজে গয়লা ঢেলি বয়"। এই ভার-সাম্যতার জন্য যে দুদিকে একই মূল্য বা একই ওজনের বস্তু সমাবেশ কর্ত্তে হবে তার কোনও মানে নাই। অর্থাৎ কোনও বস্তুর আকর্ষণের ফলে ছবির এক দিকে যদি মনটা ঝুঁকে পড়ে, এই মনোযোগের সাম্যতার জন্য তাহার বিপরীত অংশে অন্য কোনও ক্ষুদ্র বস্তু সমাবেশ কল্লেও এই ভার-সাম্যের পক্ষে যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ মনকে অন্যদিকে নিয়ে যাবার সামান্য হেতু বর্ত্তমান থাকিলেও চিত্তের উত্তমাংশে ,মন শ্রেষ্ঠতর আকর্ষণে ঝুঁকিতে থাকিবে– মনঃ-সংযোগের এই বাঞ্ছনীয় ভার-সাম্যতা (balance) চিত্র-বিজ্ঞানের রচনা-রীতির আসল কথা। পশ্চিম দেশের চিত্রে এই ভার—সাম্যতার সামঞ্জস্য ঘটান হয় কোনওরূপ বিপরীত আকর্ষণের সামগ্রী চিত্রিত করিয়া। কিন্তু পূর্ব্বদেশের চিত্রে, বিশেষতঃ চীন ও জাপান দেশের চিত্রে, এই ভার-সাম্যতা শূন্য-স্থান দ্বারা, অর্থাৎ কোনও বিপরীত আকর্ষণের বস্তু চিত্রিত না করিয়াও, চমৎকার কৌশলে সিদ্ধ করা হয়। তাহার উদাহরণ পরে দেওয়া যাইবে। পশ্চিমের চিত্রে এই ভার-সাম্যের দুই জাতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১। চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ ভারসাম্য (Formal balance).

২। অপ্রত্যক্ষ বা অন্তরের ভারসাম্য (Informal balance).

এই দুই জাতীয় ভারসাম্য দুইটী উদাহরণে বুঝা যাইবে।

প্রথম উদাহরণ।

ফ্রা এঞ্জেলিকোর 'মাতৃকা ও পরীর চিত্র' (Madonna & Angels)।

এই চিত্রে 'মাতৃকা মূর্ত্তিকে' মধ্যে বসাইয়া তাহার উভয় পার্শ্বে যে পরী-শ্রেণীর সংযোজনা করা হইয়াছে তাহা দুই দিকে সমান ভাগে বিভক্ত। বিষয় বস্তু ওজন করিয়া বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোনও দিকে বেশী কম্ নাই। এইরূপে, রেখা বা বস্তুর ভার সমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—দুইদিকের বিষয়-বস্তু প্রায় হুবহু। এই শ্রেণীর ভার-সাম্যতা (balance) কতকটা শিল্পের আদিম বা শিশু যুগে খুব প্রিয় ছিল। এইরূপ অপ্রত্যক্ষ ভার-সাম্যের নানা উদাহরণ আছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

বতিচেল্লীর—'ভিনাসের জন্ম' (Birth of Venus)।

এই জগৎ বিখ্যাত চিত্রটী অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্যের দৃষ্টান্ত। এই চিত্রের বিষয় বস্তুর সমাবেশ—ঠিক ওজন করিয়া—দুইটী সমান ভাগে বিভক্ত হয় নাই। ডান দিকের দণ্ডায়মান পরীটীর যে রূপ ও অবয়ব—বাম দিকের বস্তুটী ঠিক এক আকৃতি বা এক ওজনের নহে। অথচ বাম দিকের বস্তুটী ডান দিকের চিত্র হইতে আমাদের মনঃসংযোগ অপহরণ করিতেছে। ডাইনের

৫৮

৫৯

৬০

৬১

৬২
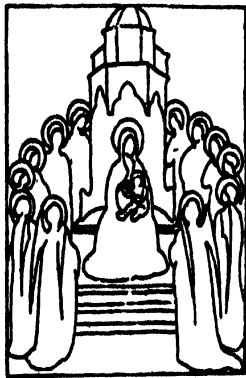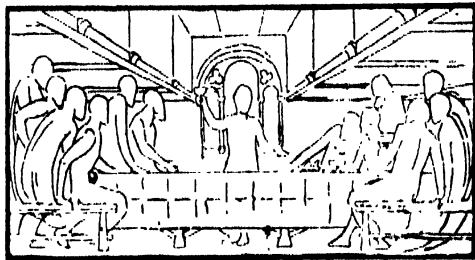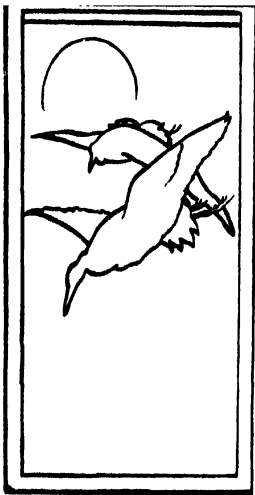
প্রতিদ্বন্দ্বী বামদিকে একটী কিছু আছে। চীনে ও জাপানী চিত্রে দেখা যায়—এই ভার-সাম্য বা পাষাণ-ভাঙ্গা কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয়-বস্তু চিত্রিত না করিয়াও কেবল বিপরীত স্থানটী একেবারে শূন্য রাখিয়া ভার-সাম্য সিদ্ধ করা হইয়াছে।

প্রথম উদাহরণ।

'উড্ডীন হংস-মালা' (Flying Geese)। (চিত্র নং ৬০)

এই চিত্রে চাঁদের খুব নিকটে উড্ডীন হংস-যুগল স্থাপিত করিয়া, চিত্রের নিম্নাংশ একবারে খালি রাখা হইয়াছে। উপরের ঐ বিষয়-বস্তুর বাহুল্য বা ভার এবং ওজন, নীচের শূন্য স্থানের—সাদা অংশ অনায়াসে টানিয়া রাখিয়াছে—নীচে কোনও বস্তুর চিত্র নাই তথাপি উপরের চিত্র-বস্তুকে স্বস্থানে রাখিয়া তাহার ভার লাঘব করিয়াছে। যদি নীচের শূন্য অংশ চাপিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে উপরের অংশ অযথা ভারে ভারাক্রান্ত এইরূপ মনে হইবে। অল্প পরিসরের মধ্যে যেন অনেক বস্তু অযথা ভীড় করিয়া আছে এইরূপ মনে হইবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

'মানুষ ও সারস' (Man and Crane by Korin)। (চিত্র নং ৬১)

এই নক্সাটীতে চিত্রিত-বস্তু চিত্র-পটের প্রায় অর্দ্ধেক অংশের সীমানার মধ্যে লিখিত হয়েছে। পটের উপর দিকের অর্দ্ধেক অংশটা প্রায় সমস্তটা খালী রাখা হয়েছে, এবং পাশে খানিকটা সার গাথা লেখার অক্ষরের মালা সোজাসুজি লম্বা করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই উপরের খালী জায়গাটা এবং এই ছোট ছোট অক্ষরের লম্বা সারি—মানুষটার প্রকাণ্ড মাথা ও অবয়বের ভারকে—শূন্য স্থানের ওজন দিয়ে টেনে রেখেছে। উপরের অংশটা যদি হাত দিয়ে ঢেকে দেখা যায়—তাহলে বোঝা যাবে যে ছবিটী অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই শূন্য জায়গার উল্টা ওজন দিয়ে, ভারের লাঘব ঘটিয়ে চিত্রকর ছবিটীকে দৃশ্য-মধুর করে তুলেছেন। যদি

অক্ষরের মালাটী লেখা না হত, তাহলে উপর অর্দ্ধের শূন্য জায়গাটা বেশী ভারী হয়ে পড়ত, এবং ভার-সাম্যতার (balance) ব্যাঘাত ঘট্‌ত। এই জন্য চিত্রকর নিজের নাম সহি করিবার ছলে—চিত্র-বস্তুর সমাবেশের ওজনটী সুকৌশলে সুবিভক্ত করে দিয়ে, চিত্রটী দৃষ্টি-মধুর করে তুলেছেন।

তৃতীয় উদাহরণ।

'কুল গাছের ডাল' (Plum Tree in Flower)। (চিত্র নং ৬১)

এই নক্সাটিতে, প্রায় একই রকম পদ্ধতিতে, অর্দ্ধেক চিত্র-পট শূন্য রেখে ভারের সাম্যতা (balance) চমৎকার কৌশলে সিদ্ধ হয়েছে। কোনাকুনি একটা লাইন টান্‌লে দেখা যাবে, যে চিত্রবস্তুটী বামদিকের প্রায় অর্দ্ধেকের মধ্যে লিখিত হয়েছে, বাকী অর্দ্ধেক জায়গাটা খালী। চাঁদের গোল চক্রটীর ওজন বামদিকের অর্দ্ধেকের উপর চাপিয়ে দিয়ে, চিত্রটীর যে ভার বৃদ্ধি হল,—ডান দিকের খালী জায়গাটা তার ওজনটী টেনে রেখে, ভারের সমতা সু-সম্পন্ন করেছে।

এই যে তিনটী চিত্রে, জায়গা খালী রেখে ভার-সাম্যতা রক্ষা করা হয়েছে—এগুলি হ'ল, 'অপ্রত্যক্ষ' রীতির উদাহরণ। কারণ 'প্রত্যক্ষ' কোনও বস্তু এই খালী জায়গায় চিত্রিত হয় নাই।

চিত্র-রচনার অতি আদীম যুগে, প্রত্যক্ষ ভার-সাম্যের (formal balance) আর একটা রূপ ছিল তাহার নাম 'মাপের সমতা' (symmetry) অর্থাৎ উভয় পার্শ্বে সমান মাপের, বা সমান ওজনের, বা সমান রূপের দুইটী বস্তু স্থাপন করা (চিত্র নং ৬৩, ৬৪, ৬৪-ক)। আলঙ্কারিক নক্‌সা ব্যতীত, চিত্র-রচনায় সমান রূপের বস্তু-যোজনার রীতি বহুদিন লোপ পাইয়াছে। যদিও গৃহ-সজ্জার রীতিতে এখনও এই নিয়ম অনেক স্থানেই অনুসৃত হয়।

৬৩

৬৭

৬৮

৬৪

৬৫

৬৬

৬৪·ক
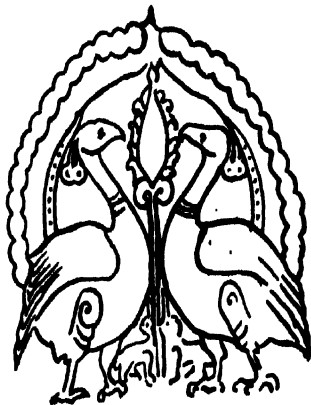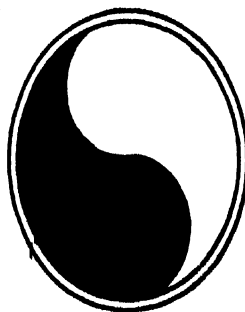
চিমাবুর—'মাতৃকা ও শিশুর মূর্ত্তিতে' ('Madonna and Child'), এই সমভাবে বিভাগ-রীতির নিয়মের কিছু অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই মাপের সমতার (symmetry) পরিবর্ত্তে, চিত্রকরগণ a-symmetry বা 'অনর্দ্ধ-খণ্ডিতের' বিভাগ রীতির বিশেষ পক্ষপাতী।

এই আধাআধি রূপের বিভাগের রীতির পরিবর্ত্তে সাদা ও কালো অর্থাৎ আলো ও ছায়ার বৈপরীত্য বা দ্বৈত্বের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। (চিত্র নং ৬৫, ৬৬)।

আলো ও ছায়া ঠিক সমান ওজনে ভাগ করা যায় না। অর্থাৎ যদি কোনও বিশিষ্ট মাপের আলোকের পাষাণ ভাঙ্গিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পরিমাণের অধিক ছায়ার সংস্থাপন করিলে তবে ভার-সাম্য (balance) রক্ষিত হয়। ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত টিসিয়ানের 'লাভিনিয়া' চিত্র। (চিত্র নং ৬৭, ৬৮) যতখানি অংশ আলোকে উজ্জ্বল তাহার প্রায় তিনগুণ বেশী অংশ ছায়ায় নিমগ্ন করিয়া তবে চিত্রকর ভার-সাম্য বা আলো ও ছায়ার পাষাণ ভাঙ্গিতে পারিয়াছেন। এই আলো ও ছায়ার বৈপরীত্যকে ইতালীর চিত্রকর নাম দিয়াছিলেন 'Chiaroscuro'

সমগ্র আকৃতি (Mass)।

কোনও বস্তু-বিশেষের সমগ্র আকৃতি (mass) আলোকের গতির গমনাগমনের পথ রোধ করে। এক বস্তু আর এক বস্তুকে আড়াল করে দাঁড়ায়। এই অন্যের পথ রুদ্ধ করিয়া বস্তুটী তাহার নিজের সত্ত্বা, তাহার নিজের রূপটীর প্রতি সম্পূর্ণরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই আলোর অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইলে আমরা সেই বস্তুর সত্ত্বা অনুভব করি - একটী অখণ্ড বস্তুরূপে, তখন, তাহার অন্যান্য অবয়ব বা বিভিন্ন অংশের অস্তিত্ব অনুভব করি না। একটা দেওয়ালের মত, একটা আচ্ছাদনের মত, একটা প্রতিবন্ধক হিসাবে তখন আমরা অনুভব করি। এই অন্তরালের

নিজের অঙ্গের নানা খুটীনাটীর কোনও বিচার করিয়া দেখি না, বা দেখিবার অবকাশ পাই না। বস্তুটা তাহার সমগ্র আকৃতি (Mass) লইয়া অন্য বস্তুর দর্শনের পথরোধ করে। অন্য বস্তুকে দেখিতে দেয় না। সম্মুখের ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষটি তাহার নিকটস্থ ছোট ছোট ঝোপ ও লতাপাতার আড়াল নিয়ে, সামনের ঐ বাড়ী দেখবার পথ রোধ করে দাঁড়াল (চিত্র নং ৬৯)। যখন এই সমগ্র আকৃতি (mass) আমরা অন্তরাল রূপে, সমগ্ররূপে, অখণ্ডরূপে, বৃহৎরূপে অনুভব করি, তখন তাহার খণ্ডাংশের খুটিনাটী (details) আমাদের চোখে পড়ে না। এই অখণ্ডরূপ, সমগ্ররূপ, এই বৃহৎ রূপ – তাহার খণ্ডাংশকে অতিক্রম করে দাঁড়ায়। দূর থেকে গাছের কাল ছায়া আকাশের অলোর পথ রোধ করে দাঁড়ায়,—তখন তাহার পাতা, ফল, কি শাখা-প্রশাখা আমাদের নজরে পড়ে না।

ঘন নীল বর্ণের আকাশের কোনে, সাদা সাদা ঘন মেঘ, তাহার কুণ্ডলী পাকান প্রকাণ্ড, তুষার আবৃত হিমালয়ের রূপ নিয়ে, নীল আকাশের অনেকটা বন্ধ করে দাঁড়ায় (চিত্র নং ৭১)। তেমনি আবার সাদা আকাশের অপর্য্যাপ্ত আলোকের অনেকখানি আড়াল করে, বন্ধ করে দাঁড়ায় আমাদের সহরের ঘেসাঘেসি ঠেসাঠেসি করে সাজান নানা রকমের বাড়ী-ঘর, বা স্তম্ভ-শ্রেণী (চিত্র নং ৭০, ৭২)। তাহাদের সম্মিলিত দেয়ালের আড়াল, একটী অখণ্ড দুর্গের, মত আকাশের আলোর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তখন প্রত্যেক বাড়াটির চেহারা কেমন, তাহার ঘর, দুয়ার, জানলা, আমাদের চোখে পড়ে না।

দৃশ্য-চিত্রকর যখন কোনও প্যানরমা (panoroma) বা অখণ্ড এক-টানা দৃশ্যাবলী চিত্রিত করেন, তখন তাহাকে এই বিভিন্ন পরিমাপের সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা সুদৃশ্য পরিমাপের অনুপাত (proportion) কল্পনা করে নিতে হয় (চিত্র নং ৭৩-ক)। এই বৃক্ষরাজীর সমগ্র আকৃতি ও তাহার পশ্চাতের বস্তুর মধ্যে একটা সুদৃশ্য, সুমিষ্ট নয়নমুগ্ধকর, চোখের তৃপ্তিকর একটা পরিমাণ (proportion), বা ভারসাম্যতা (balance), বা ওজনের সাম্যতা (equilibrium) সৃষ্টি করে নিতে হয়। সমগ্র আকৃতির (mass) ব্যবধানের দীর্ঘ প্রস্থ যদি তাহার পশ্চাতের বস্তুর দীর্ঘ

৬৯

৭০

৭১

৭৩ ক

৭২

৭৩
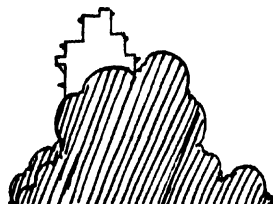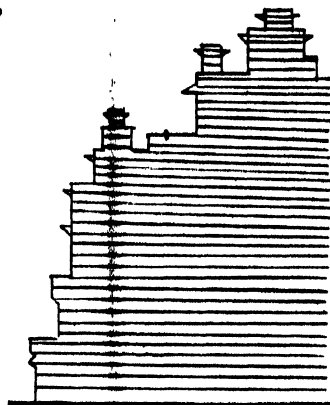
প্রস্থ অপেক্ষা অতিমাত্রায় বড় হয়, তাহা হইলে সামনের ব্যবধানটী (mass) ভারাক্রান্ত হয়ে, সমগ্র ছবিটীর ভার-সাম্যতা (balance) নষ্ট করে। এই দুইটী বস্তুর মধ্যে একটী চক্ষুর তৃপ্তিকর অনুপাত ও আপেক্ষিক পরিমাপ রক্ষা করা চিত্রকরের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আলো ও ছায়ার সমগ্রতার অনুপাত (equilibrium of mass) চিত্র রচনার ছন্দের একটী বিশিষ্ট উপকরণ। ফরাসী চিত্রকর কোরোর (Corot) লিখিত একটী চিত্রে ('অপ্‌সরার নৃত্য') এই আলো ও ছায়ার অনুপাতের সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। (চিত্র নং ৭৩)।

ছন্দ-লীলা (Rhythm)।

চিত্ররচনার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ও আদর্শ, রূপের ছন্দের বা ছন্দগতির সুন্দর প্রকাশ। এই ছন্দগতি বা ছন্দলীলা (Rhythm), ঠিক কি সামগ্রী তাহা কথায় প্রকাশ করা বড় কঠিন। চীন ও জাপানী চিত্রে এই Rhythm বা ছন্দলীলা চিত্রের অতি আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। এই ছন্দলীলা রূপের নাড়ী স্পন্দন। সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় ছন্দের রূপ ও সত্বা আমরা সহজে বুঝতে পারি। চিত্রে ছন্দের গতি অনুভব করা একটু কঠিন। একটা গতির ভাব অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কেবল একটা বাঁধা পথে আসা যাওয়াকেই ছন্দ বলা যায় না। নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে, নানা ছোট বড় তালে এবং বিরামে, ছন্দ আপনাকে প্রকাশ করে। অনেক সময় ছন্দের রূপটী কি তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ঘড়ির দোলক-দণ্ডের (pendulum) উদাহরণ দিই, কিন্তু ঘড়ির ছন্দ, দোলক-দণ্ডের ছন্দ,—যন্ত্রের ছন্দ। ইহার মধ্যে বিচিত্রতার, কি নূতনতার অবকাশ নাই। ছন্দের একটা উৎকৃষ্ট রূপ প্রকাশ পায়—যতি বা বিরামের সাহায্যে। নানা ছন্দের নানা কালের গতি ও বিরামের সংমিশ্রণে উচ্চ শ্রেণীর, সূক্ষ্ম স্বাদের ছন্দ রচিত হয়। ছন্দের একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহার অনুকরণে অন্য মানুষকে প্রলোভিত করে। গানের ছন্দে অনেক শ্রোতাকে যোগ দিতে হয়। সহজ নৃত্যের তালে অনেকের পা আপনি নড়ে ওঠে।

কবিতায় ও চিত্রে ছন্দের গতি-লীলা প্রত্যক্ষভাবে দেখান সম্ভব নয়। কারণ কবিতা ও চিত্রের বিষয়-বস্তু নড়িতে পারে না। কাগজে বা ফলকে আবদ্ধ স্থির ও গতিহীন অক্ষর ও রেখায় লিপিবদ্ধ থাকে। চিত্রে গতি দেখাইবার এক মাত্র উপায় বাঁকা রেখা-সমষ্টির আশ্রয় গ্রহণ (চিত্র নং ৭৬, ৭৯)। বাঁকা রেখার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া গতির বা গমনের আভাষ দেওয়া যায়। সরল রেখা অবলম্বন করেও গতির ভাব বুঝান যায় (চিত্র নং ৭৭)। একটী পদ্মের মৃণালের আঁকা বাঁকা রেখায় গতির চিত্র সহজে ফুটিয়া আছে (চিত্র নং ৭৮)। এই বাঁকা রেখার প্রত্যেক বাঁকে একটা নির্দ্দিষ্ট সংযত ভঙ্গী আছে। এই সংযত ভঙ্গী ছন্দের সৃষ্টি করে। অসংযত গতির মধ্যে ছন্দ ফুটে না। সুতরাং যতি বা সংযম ছন্দের অতি আবশ্যকীয় প্রাণশক্তি। উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল গতির মধ্যে ছন্দ প্রকাশ পায় না।

চিত্রের মধ্যে রেখার নানা ভঙ্গীর গতির মধ্যে একটা নিয়ম, সংযম বা যতির নিগড়ে গাঁথিতে পারিলে ঐ সমস্ত রেখার মালা ছন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। এই যতির বাঁধনে আবদ্ধ হইলে বিভিন্ন হাড়ের খণ্ড প্রাণ পাইয়া জীবন্ত হইয়া উঠে। সাঞ্চী স্তূপের অনেক পাথরের নক্সায় পদ্মের মৃণালের ছন্দলীলার অতি সুমধুর চিত্র লেখা আছে। (চিত্র নং ৭৮)।

ঘড়ির দোলক-দণ্ডের গমনাগমনের পথ (চিত্র নং ৭৪) যদি রেখার ভাষায় রূপ দেওয়া যায়,—তাহা হইলে, একটী অখণ্ড বাঁকা রেখার তরঙ্গ মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে (চিত্র নং ৭৫)। এই ছন্দে গাঁথা বাঁকা রেখার উপর চোখ বুলাইলে বেশ তৃপ্তি অনুভব করা যায়,—এই রেখা তরঙ্গের সমান তালের, সমান মাপের মধ্যে ছন্দ-লীলার রস অনুভব করিয়া চক্ষু তৃপ্তি লাভ করে (চিত্র নং ৮১)। সাপের চঞ্চল শীঘ্র গতিলীলার মধ্যে ইহার অনুরূপ ছন্দরসের আভাস আমরা পাই (চিত্র নং ৭৫-ক)। সমুদ্রের তরঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন দোলার পুনঃ পুনঃ উঠা নাবার মধ্যে ছন্দ-লীলার একই রকম স্বাদের মধুর রসটী আমাদের মনকে দোলা দেয় (চিত্র নং ৭৯)। চীন ও জাপান দেশের চিত্রকরগণ এই সমুদ্রের লহরী-মালার অদ্ভুত গতিলীলা ও উত্থান পতনের জীবন-চরিত অদ্ভুত রেখা রসে জীবন্ত করিয়া তুলিবার কৌশলে সিদ্ধ-হস্ত। (চিত্র নং ৮০)।

৭৪

৭৬

৭৭

৭৯

৭৮

৭৫

৭৫-ক

৮০

৮১
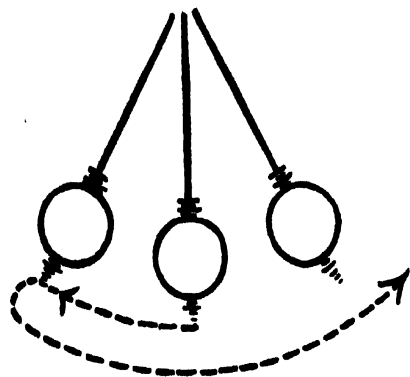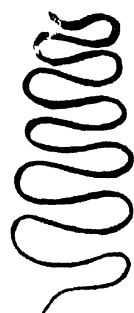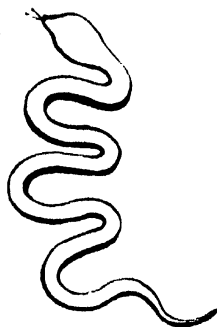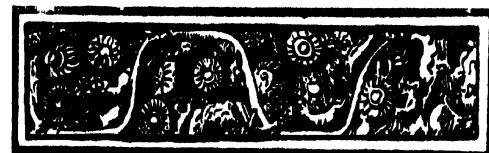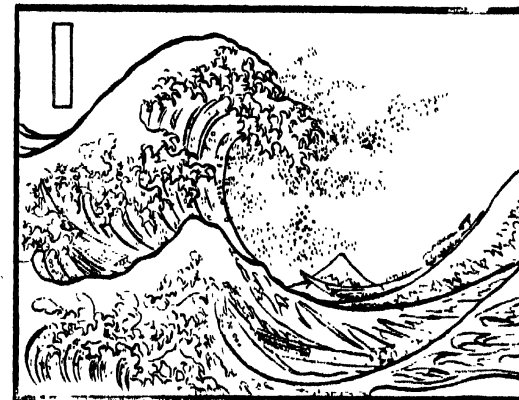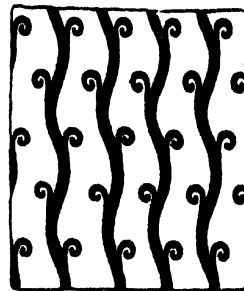
আকাশ, ক্ষেত্র, ভূমি, স্থান, পরিসর (SPACE)।

রেখা প্রসারিত করিবার স্থান বা ক্ষেত্র চাই। ক্ষেত্র না থাকিলে রেখার অস্তিত্ব থাকে না। একটা পটভূমি না থাকিলে চিত্রলেখা যায় না। এই প্রসারিত করিবার গুণ, এই বিস্তৃত করিবার আবশ্যকতা, আকাশকে, ক্ষেত্রকে, পটভূমিকে বিস্তৃতি (space) দান করে। রেখাদ্বারা, বিশেষতঃ সরল-রেখা দ্বারা বিস্তৃতির আভাষ ও অনুভূতি হয়। এই আকাশ, এই বিস্তৃতি, এই ক্ষেত্র (space) যাবতীয় বস্তুর দাঁড়াইবার স্থান, গতি ও গমনাগমনের পথ ও পরিসর। এই বিস্তৃতি, তিন প্রকারের ১। দীর্ঘ ২। প্রস্থ ৩। গভীরতা, বা দূরত্ব। চিত্রে দীর্ঘ ও প্রস্থের দুই মানের ক্ষেত্রের মধ্যে তৃতীয় মানের অর্থাৎ গভীরতা বা দূরত্বের আভাষ দেওয়া চিত্রকরের প্রধান উদ্দেশ্য। এই তিন প্রকারের মানের গুণ লাভ করিয়া, কল্পনার চিত্র বা নকল চিত্র, আসল বা সত্য বলিয়া ফুটিয়া উঠে, এইরূপ মনে হয়। আলো ও ছায়ার সাহায্যে যাহা সমতল ছিল তাহা তৃতীয় মানের ঘনতা বা গভীরতা লাভ করিয়া উঁচু হইয়া উঠে, পটভূমিকা ত্যাগ করিয়া ফুলিয়া উঠে, চোখে— অন্ততঃ এইরূপ মনে হয়। এই ঘনমানের মায়া-সৃষ্টির নাম চিত্র। নিপুণ চিত্রকর রেখার বিন্যাসের কৌশলে এবং আলো ও ছায়াপাত করিয়া, জীবের মূর্ত্তির স্থূলতা (solidity) গভীরতা, মাংসলতা, তাহার গোলাল রূপের আভাষ বা মায়া সৃষ্টি করেন। এই রেখা বা ছায়ার সংযোগে পূর্ব্বে যাহা পট-ভূমির সহিত লিপ্ত ছিল, সমতল ছিল, তাহা স্ফীত হইয়া উঠে, গোল হইয়া উঠে, সত্য বলিয়া সজীব বলিয়া ভ্রম হয়। যাহার মাপ পূর্ব্বে দীর্ঘে ও প্রস্থে ছিল, এখন তাহা গভীরতা বা ঘনমান (depth) লাভ করে। দৃশ্য-চিত্রে (landscape) এই ঘনমান বা গভীরতা বা দূরত্বের আভাষ দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। দৃশ্যটী যে চোখের সম্মুখে সোজা বহুদূর চলিয়া গিয়াছে তাহার আভাষ না দিলে দৃশ্য-চিত্র সত্য বলিয়া মনে হয় না। এই বিস্তৃতি, বা গভীরতা, বা পরিসরের মায়া সৃষ্টি না করিতে পারিলে, চিত্রিত দৃশ্য-চিত্র ফলকে সত্যের রূপ লইয়া সজীব হইয়া ফুটিয়া

উঠে না। এই সত্যের রূপ বা মায়া সৃষ্টি করিবার, এই গভীরতা বা ঘন-মানের আভাষ দিবার একাধিক উপায় ও পদ্ধতি আছে। প্রথমতঃ, দূরের বস্তুকে আকারে ছোট করিয়া চিত্র করিলে বস্তুটী দূরে রহিয়াছে এইরূপ প্রতীতি হয়। দ্বিতীয়তঃ, দূরের বস্তুকে স্পষ্ট করিয়া না লিখিয়া, অস্পষ্ট করিয়া, আব্‌ছায়ার চিত্রে লিখিলে,—দূরত্বের আভাষ দেওয়া যায়।

পশ্চিমদেশের চিত্র-পদ্ধতিতে সাধারণতঃ, আলো ও ছায়ার সাহায্যে বস্তুকে গভীরতা বা ঘনমানের স্ফীতি দ্বারা উদ্বোধিত করিবার প্রবৃত্তি বেশী দেখা যায়। পশ্চিমদেশের চিত্রে, আলো ও ছায়াপাত চিত্রপদ্ধতির অপরিহার্য্য অঙ্গ। পশ্চিম দেশের শিল্পীরা আলো ও ছায়ার পথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্র রচনার কথা কল্পনা করিতে পারেন না। পূর্ব্বদেশের শিল্পীরা আলো ও ছায়াপাত কিম্বা গভীরতা (depth), বা স্ফীতির (relief) সাহায্যে একটা সত্যের, বা বাস্তবিকতার মায়া সৃষ্টি করা চিত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। সাধারণতঃ, পূর্ব্ব দেশের চিত্রে, এই বাস্তবিকতার উপকরণ অলো ও ছায়াপাতের কোনও চেষ্টাই প্রায় থাকে না। এই জন্য, প্রায়ই, চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের চিত্র আলো ও ছায়া বর্জ্জিত সমতলক্ষেত্রে লগ্ন—উচ্চ নীচতার আভাষ বর্জ্জিত (flat) চিত্র। পূর্ব্বদেশের চিত্রশিল্পীরা মনে করেন যে, ছবির ছবিত্ব, বাস্তবিকতার মায়া-সৃষ্টি দ্বারা নষ্ট করা উচিৎ নহে। উপরন্তু, আলোক ও ছায়ার উজ্জ্বলতা ও অন্ধকার সৃষ্টি করিলে রেখা নিমজ্জিত হইয়া যায়—রেখার রস আস্বাদন ও গুণ বিচারের অবসর পাওয়া যায় না। এইজন্য পশ্চিম দেশের চিত্র আলোক ও ছায়াপ্রধান। পূর্ব্ব দেশের চিত্র রেখা-প্রধান।

দৃশ্য-চিত্রে (landscape painting), বা গল্প-চিত্রে (narrative painting) যেখানে পশ্চাতের পটভূমিতে স্থিত বস্তু, বা মূর্ত্তি বিশেষের পরিচয় দিবার আবশ্যকতা আছে, পূর্ব্বদেশের শিল্পীরা একটী নূতন পদ্ধতি দ্বারা দূরত্ব, বা গভীরতার ইঙ্গীত দিয়া থাকেন। যে বস্তু যত পিছনে থাকে চিত্রফলকে

তাহার তত উচ্চ স্থান। যেমন মনে করা যাউক, যে একজন মানুষের পশ্চাতে একটী বৃক্ষ আছে, তাহার পশ্চাতে একটী গৃহ, বা মন্দির আছে (চিত্র নং ৮২)। চিত্রপটে মানুষের চিত্রটী সর্ব্ব নিম্নভাগে থাকিবে, তাহার উপরে থাকিবে বৃক্ষটী, তাহার উপরে থাকিবে মন্দির। চীন দেশের দৃশ্য-চিত্রে এই পদ্ধতির নানা দৃষ্টান্ত আছে। ভারতের নানা যুগের নানা শিলা-ফলকে এই পদ্ধতির প্রয়োগের অনেক দৃষ্টান্ত আছে (চিত্র নং ৮৩)

বর্ণ (COLOUR)।

বর্ণ সৃষ্টি-তত্ত্বের একটী জটীল রহস্য। বিজ্ঞান বর্ণ সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব আবিস্কার করিয়াছে। তাহার মধ্যে একটী তত্ত্ব এই, যে, মানুষ রেখার দ্বারা আবদ্ধ বা লিখিত বস্তুর রূপ (Form outlined by line) বুঝিবার বহু পূর্ব্বে বর্ণের শক্তি অনুভব করে। শিশুরা অতি অল্প বয়সেই বর্ণবোধ শক্তির পরিচয় দেয়। অনেক পশুরও বর্ণবোধ শক্তি আছে। মানুষের মনের উপর বর্ণের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। কবিতায় সুর সংযোগ করিলে কবিতা যেমন নূতন মূল্য পাইয়া, উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, বর্ণহীন বস্তু বা রেখা-চিত্রে বর্ণ সংযোগ করিলে, তাহা নূতন ভাবে ও রসে আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে। রেখা-চিত্র আমাদের বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, আমাদের মনে চিন্তার রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে। বর্ণ আমাদের মনে ভাব-রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে।

প্রত্যেক শ্বেত রশ্মির মধ্যে সাতটী বিভিন্ন জাতির বর্ণ নিহিত ও লুক্কায়িত আছে। ত্রিকোণ পরকলার (Prism) মধ্য দিয়া শ্বেত রশ্মিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, এই সাতটী বিভিন্ন বর্ণের রশ্মি আমাদের চোখে পড়ে। এই সাতটী রশ্মি—বেগুনি (Violet), তুঁতে (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হরিদ্রা (Yellow), কমলা (Orange) এবং লাল (Red)। এই সাত সুরের বর্ণকে ইংরাজীতে Spectrum বলে। এই সাত বর্ণের মধ্যে ৪টী বর্ণ অন্য বর্ণের মিলনে

৮১

৮০

উৎপন্ন হয়, যেমন বেগুনি—লাল এবং নীল বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন ; সবুজ বর্ণ, হরিৎ ও নীলবর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন ; এবং তুঁতে বর্ণ, নীল ও সবুজ বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় : এবং কমলা বর্ণ, লাল ও হরিদ্রা বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং, লাল, হরিৎ এবং নীল এই তিনটী বর্ণ—মূল, বা শুদ্ধ বর্ণ (Primary or Pure colour) অন্য কোনও বর্ণের সম্মিলনে বা সংমিশ্রণে এই তিনটী বর্ণ উৎপন্ন হয় না। যেমন সাতটী বর্ণের একত্র সংযোগে শ্বেত বর্ণ উৎপন্ন হয়, তেমনি সমস্ত বর্ণের অভাবে কৃষ্ণ বর্ণ উৎপন্ন হয়। উচ্চ সুরের মূল বর্ণ বা শুদ্ধ বর্ণকে কেহ কেহ উত্তপ্ত বা তেজী বর্ণ (hot colours) বলিয়া থাকেন, এবং নীচু সুরের মিশ্রিত বর্ণকে শীতল বা স্নিগ্ধ বর্ণ (cold colours) বলিয়া থাকেন। উঁচু সুরের শব্দ যেমন আমাদের কর্ণকে পীড়িত করে, উঁচু সুরের বর্ণ তেমনই আমাদের চক্ষুকে উত্তেজিত, বা পীড়িত করে। নীচু মোলায়েম সুরের বর্ণ দেখিলে আমাদের চক্ষু জুড়ায়, শীতলতার অনুরূপ তৃপ্তি অনুভব করে।

প্রকৃতির নানা বস্তুর নানা বিভিন্ন বর্ণের রঙ আমাদের চক্ষুকে আকৃষ্ট করে, উত্তেজিত করে, অভিভূত করে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে বিভিন্ন বস্তুর, বিভিন্ন জাতির বর্ণকে আত্মসাৎ করিবার (absorb), পরিপাক করিবার শক্তি আছে। এই শক্তি তাহাদের অনুগত মজ্জাগত শক্তি। যে বর্ণটী যে বস্তু আত্মসাৎ করিতে-পারে না, সেই বর্ণটীই তাহার দেহে ফুটিয়া উঠে এবং তাহা আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়। শ্বেত বর্ণের আলোক যখন রক্ত জবার উপর পড়ে তখন শ্বেতবর্ণে নিহিত ছয়টী বর্ণই রক্ত জবা আত্মসাৎ করিয়া লয়, কেবল বাকী থাকে রক্ত বর্ণ, এই অবশিষ্ট বর্ণটী, যাহা জবাফুল পরিপাক করিতে পারে না, তাহার দেহে ফুটিয়া উঠে। এইরূপে হরিদ্রা বর্ণের পুষ্প, হরিদ্রা বর্ণ ব্যতীত আর সমস্ত বর্ণ আত্মসাৎ করিয়া লয়, সুতরাং হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়। যে বস্তু কোনও বর্ণ আত্মসাৎ করিতে পারে না, তাহা শ্বেত বর্ণে প্রতিভাত হয়। সাত বর্ণের নানা অনুপাতের মিশ্রণে, শত শত বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি হয়। এই একাধিক বা সংমিশ্রিত বর্ণে শত শত নূতন বর্ণের নানা গভীরতা, বা ওজনের নানা বর্ণ

ইচ্ছামত উৎপন্ন, করা যায়। গভীরতার তারতম্য হিসাবে, গাঢ়, ফিকে, গভীর, ভারী, হাল্‌কা, ইত্যাদি বিভিন্ন ওজনের (value) বর্ণ. চিত্র-শিল্পীরা প্রয়োজন অনুসারে উৎপন্ন করেন। প্রত্যেক সাত সুরের মধ্যে মধ্যে যেমন অনেক সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম শ্রুতির (vibration) সুর আছে এবং ওস্তাদ সঙ্গীতজ্ঞরা তাহার প্রয়োগ করেন, সেইরূপে এক এক বর্ণের অন্তর্গত নানা গভীরতার অনুপাতে নানা ওজনের সূক্ষ্ম অতি-সূক্ষ্ম নানা পর্য্যায়ের (gradation) বর্ণ আছে। প্রকৃতির নানারূপে এই বিভিন্ন পর্য্যায়ের নানা সূক্ষ্ম, অতি-সূক্ষ্ম. কোমল, অতি-কোমল বর্ণের সমারোহ আমরা দেখিতে পাই। সূর্য্যাস্তের সময় আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এক এক বর্ণের নানা পৈঠার (scale), নানা পর্য্যায়ের (gradation), নানা ওজনের (value) সূক্ষ্ম, অতি-সূক্ষ্ম বিভেদ ও রেশ আমাদের চোখে পড়ে।

এই বর্ণের সমারোহ, ওস্তাদ শিল্পীদের তুলিকায় নূতন ঐশ্বর্য্যের সমারোহ, রেখায় লিখিত চিত্রকে নূতন সম্পদ, নূতন মূল্য দান করে, নূতন ভাব ও রসে উজ্জীবিত করে। এই জন্য শিল্পীর হাতে, বর্ণ একটী নূতন শক্তির অভিনব উপকরণ ও অস্ত্র।

এক বর্ণ এবং অন্য বর্ণের মধ্যে নানা জাতির সম্পর্ক ও সম্বন্ধ আছে। কতকগুলি বর্ণের মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক আছে। এবং কতকগুলি বর্ণের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক কতকটা সঙ্গীত-শাস্ত্রের বাদী-বিবাদী সুরের সম্পর্কের অনুরূপ। এক জাতির বর্ণ অন্য জাতির বর্ণকে সহায়তা করে, তাহার পোষকতা করে। এক একটী বর্ণ অন্য এক একটী বর্ণকে বিদ্বেষ করে, তাহার শক্তি ক্ষয় করে, তাহার প্রভাবের বিরুদ্ধতা আচরণ করে। বিচক্ষণ শিল্পীরা এই বিপরীত রীতির, বিবাদী ও মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ বাদী বর্ণের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া, আপনার প্রয়োজন অনুসারে চিত্রে সংযুক্ত করিয়া, নিজ নিজ অভীপ্সিত ভাবের সৃষ্টি করেন।

এক হিসাবে, যেমন এক একটী বর্ণ অন্য এক বর্ণের বিরোধী—এই দুই বিবাদী বর্ণের সমন্বয়ে ও সম্মিলনে, তাহাদের বিবাদ তিরোহিত (neutralise) হইয়া শ্বেত বর্ণের উদ্ভব হয়। এইজন্য যে বর্ণের যোগ করিলে তাহা পূর্ণ হইয়া শ্বেত বর্ণের যুক্ত-বর্ণে পরিণত হয়, তাহাকে পূরণকারী (complimentary)বর্ণ বলে। এইরূপ, রক্ত বর্ণ নীলাভ সবুজ বর্ণের পূরক (complimentary) বর্ণ; কমলালেবুর বর্ণ সবুজাভ নীল বর্ণের পূরক; হরিদ্রা বর্ণ ঘন নীল বর্ণের (ultramarine) পূরক, সবুজাভ হরিদ্রা বর্ণ, বেগুনিয়া বর্ণের পূরক, সবুজ বর্ণ, পিঙ্গল বর্ণের (purple) পূরক।

পূর্ব্ব দেশের চিত্রশিল্পে বর্ণের সদ্ব্যবহার বহু যুগ পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পশ্চিম দেশে বর্ণের সদ্ব্যবহার ১৪ শতকের পূর্ব্বে প্রয়োজিত হয় নাই। ইতালীর চিত্রকরগণ প্রথম বর্ণের যথোপযুক্ত ব্যবহারের প্রবর্ত্তন করেন। ইতালীর নব যুগের (Renaissance) চিত্রকরগণ প্রথমে বৈজান্তাইন শিল্পীদের উদাহরণ অবলম্বন করিয়া, চিত্র-শিল্পে বর্ণ সমারোহের সূত্রপাত করেন। বৈজান্তাইন শিল্প মূলতঃ পূর্ব্বদেশের প্রাচ্য-শিল্প ধারার (Schools of Oriental Painting) প্রতিনিধি। প্রাচীন গ্রাক ও রোমক শিল্পে, বর্ণের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় না। ফ্লরেন্স সহরের ওস্তাদ-শিল্পীরা, চিত্রে বর্ণের সদ্ব্যবহার করিয়া, ধর্ম্মসাধনার উদ্দীপনায় বিশেষ সহায়ক হইয়াছিলেন। ভেনিস সহরের ওস্তাদ-শিল্পীরা (Venetian Masters). যাঁহারা প্রাচ্য-দেশ হইতে আনীত পণ্য-দ্রব্যের মধ্য দিয়া, বর্ণ-প্রয়োগের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, ইতালীর চিত্রশিল্পে এক নূতন বর্ণ প্রয়োগের বাণী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ইতালীয় শিল্পীদের মধ্যে পেরুজিনো, বতিচেল্লী, তিষিয়ান ও জর্জ্জিয়ন—বর্ণ-সংযোজনায় অদ্ভুত ঐন্দ্রজালের পরিচয় দিয়াছেন। পেরুজিনো এক নূতন আভার নীল ব্যবহার করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বতিচেল্লী তাঁহার প্রভাত আলোকের নরম সুরের হরিতাভ বর্ণ প্রয়োগে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিষিয়ানের চিত্রে সুবর্ণ বর্ণের সুষমা অতি প্রসিদ্ধ। জর্জ্জিয়নের চিত্রে গোলাপী

আভার জয় ঘোষণা করিয়াছে। স্পেন দেশে বর্ণ প্রয়োগের প্রথম সূত্রপাত করেন ভেলাকুয়ে। তাঁহার চিত্রে নানা সুরের, নানা পর্য্যায়ের, ধূসর বর্ণের সূক্ষ্ম প্রয়োগ দেখা যায়। উত্তর ইউরোপে, (হল্যাণ্ডে) ভান ঈক ও ভেরমীর নিপুণ বর্ণশিল্পী (colourist) ছিলেন। ইংলণ্ডে বর্ণের যাদুকর ছিলেন টর্ণার। তাঁহার চিত্রিত অনেক দৃশ্য-চিত্রে বর্ণের নানা অলৌকিক নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। ফ্রান্সে, ১৯ শতকের শেষ পাদে, একদল নূতন শিল্পী [তাহাদের নাম প্রতীতি-বাদী (Impressionists)] বিজ্ঞানের সাহায্যে চিত্র-শিল্পে নূতন রীতির বর্ণ প্রয়োগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভান্-গো ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর্ণ-শিল্পী।

বর্ণের বৈপরীত্য (Contrast) ও ঐক্যতান (Harmony)।

আলো ও ছায়ার মধ্যে যেমন একটা দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্য আছে, কোন কোন বর্ণের মধ্যে এইরূপ বিপরীত রসের ভাব আছে। ওস্তাদ শিল্পীরা কৌশলে এই বর্ণ-বৈপরীত্য দ্বারা অনেক অভিনব রসের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কুশল শিল্পীর হাতে উপযুক্ত অনুপাতে ব্যবহৃত হইয়া, এই বর্ণের বৈপরীত্য (contrast) অভিনব উপভোগ্য রসের অবতারণা করে। কোনও চিত্রে অতি মাত্রায় নীলবর্ণের অবতারণা করিলে, তাহার ভার লাঘবের জন্য, তাহার পাষাণ ভাঙ্গিবার জন্য (contrast), উপযোগী আভার লোহিত বর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। ইতালীর শিল্পী পেরুজিনোর লিখিত অনেক চিত্রে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। চিত্রশিল্পে, ইউরোপের শিল্পীরা প্রায়ই শুদ্ধ, বা মূল বর্ণ (Pure or Primary colour) ব্যবহার করেন না। পূর্ব্ব-দেশের চিত্র-শিল্পে এই শুদ্ধ বর্ণের প্রয়োগ ও বৈপরীত্য বহুল পরিমাণে দেখা যায়। ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত পারস্য দেশের চিত্রাবলী এবং ভারতের রাজপুত ও পাহাড়ী পদ্ধতির চিত্রকলা। নানা বিভিন্ন ও বিপরীত রসের বর্ণের সমন্বয় করিয়া, একটা এক সুরের সঙ্গতির নিগড়ে বাঁধিয়া
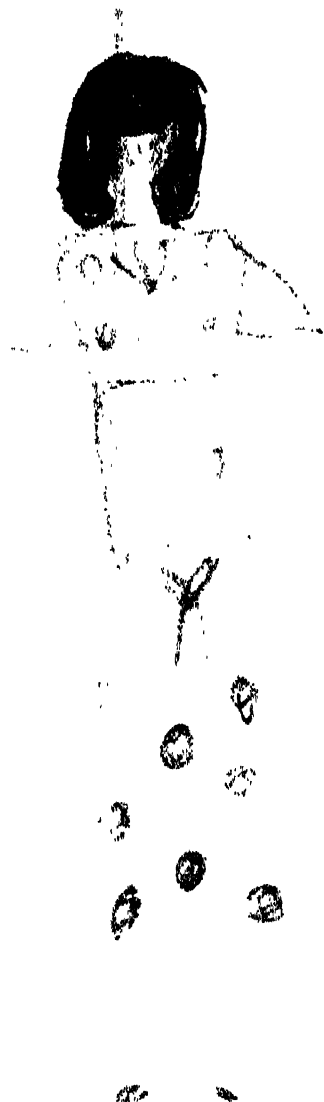
ওস্তাদ-শিল্পীরা বর্ণের ঐক্যতানের (Harmony) সৃষ্টি করিতে পারেন। এই বিভিন্ন ওজনের, বিভিন্ন মূল্যের, নানা বিভিন্ন সুরের বর্ণের মধ্যে ঐক্য সাধন করা, চিত্রশিল্পের একটী দুরূহ ও বাঞ্ছনীয় কৌশল। যিনি এই বর্ণের ঐক্য সাধন করিতে না পারেন, তাঁহার চিত্র ব্যর্থ রচনা। এই নানা সুরের বর্ণ-সংযোজনার মধ্য দিয়া ঐক্য ফুটিয়ে তোলা, চিত্র-শিল্পের প্রধান অনুসরণীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য। অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র-রচনা, বর্ণের ঐক্যতার অভাবে, বর্ণের ভার-সাম্যতার (balance) অভাবে, শক্তিহীন হইয়া পড়ে। চিত্রের বক্তব্য ও ভাব-প্রকাশ, সার্থক হয় না ও সিদ্ধ হয় না। কোন বর্ণের পাশে কোন বর্ণ সংযোজনা করিলে, তাহার রচনার সঙ্গতি রক্ষা হইবে, ইহা বিচার করিবার শক্তি অতি সূক্ষ্ম বর্ণরসবোধের উপর নির্ভর করে।

ভাস্কর্য্য

(SCULPTURE)

ভাস্কর্য্য ও তক্ষণ (খোদাই) শিল্প তিন মানের চিত্র :—দীর্ঘ, প্রস্থ, ও ঘনমান (length, breadth and depth—three dimensions)। প্রকৃতির নানা দ্রব্য ও মূর্ত্তি যেমন তিন মান (three dimensions) দ্বারা আকাশ ও পরিসর জুড়িয়া বসিয়া থাকে, তাহার অনুকরণ করিয়া, ভাস্কর ও মূর্ত্তিকার, বাস্তবিক প্রতিমূর্ত্তি গড়ে তোলেন, কিম্বা আস্ত কাঠ কি পাথর কেটে মূর্ত্তি বাহির করিয়া দেখান। একটা চতুষ্কোণ পাথর, কাঠ, কিম্বা হাড় কিম্বা এইরূপ কোনও কঠিন বস্তু তাহার অনাবশ্যকীয় অংশ ক্রমে ক্রমে বাটালি দ্বারা কিম্বা অন্য যন্ত্র দ্বারা অপসারিত করে, ভাস্কর তাঁহার অভীপ্সিত মূর্ত্তি আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলেন। কোনও গোলাকৃতি বৃক্ষের ডাল কেটে, তাকে চতুষ্কোণ রূপ দিয়ে, চৌমুখ চার-পলা একটী স্তম্ভ প্রস্তুত করা যেতে পারে (চিত্র নং ১)। ভাস্কর-শিল্পের এটী হল অত্যন্ত সহজ ও সরল (simple) উদাহরণ। বাস্তবিক ভাস্কর-শিল্প অত সহজ ও সরল নহে। কাঠ কিম্বা পাথর খোদাই করে, চৌমুখ বা চৌপলা বস্তু খোদাই করা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমের স্থূল নৈপুণ্যের আদিম-কালের তক্ষণ-বিদ্যা। প্রাক্ঐতিহাসিক যুগে, পশুর হাড় খোদাই করে নানা পশুর আকৃতির চলনসই প্রতিমূর্ত্তি আদীম কালের শিল্পীরা গড়ে গেছেন। প্রায় ২৫০০০ পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত এইরূপ হাড়ের খোদাই করা পশুর মূর্ত্তি স্পেনের পিরীনীজ পর্ব্বতের গুহায় পুরাতাত্ত্বিকেরা খুজিয়া বাহির করিয়াছেন (চিত্র নং ২)।

১

২-ক
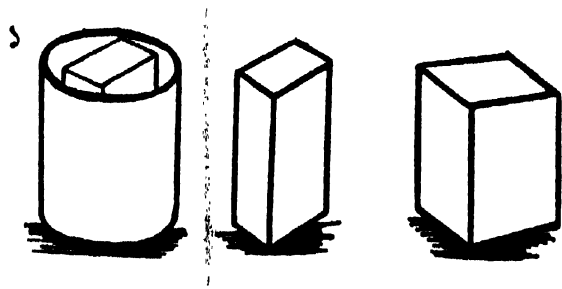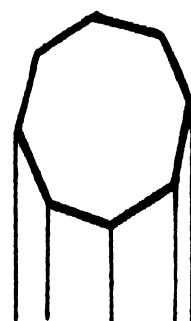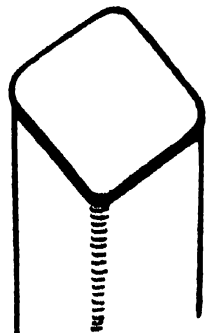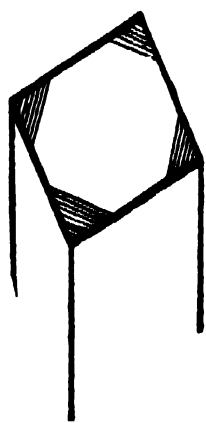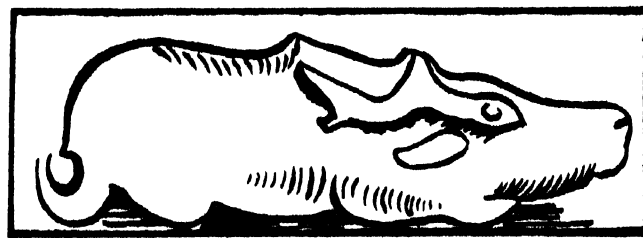
এই প্রাক্‌ঐতিহাসিক যুগের আদীম যুগের আদীম ভাস্কর শিল্পী, উপযুক্ত উপাদানের (natural) অভাবে ইচ্ছামত মূর্ত্তি রচনা করিবার সুযোগ পান নাই। কোনও পশুর হাড়ে যাহাতে মোটামুটি কোনও পশুর, বা মানুষের মূর্ত্তির আদল আছে এইরূপ উপাদান লইয়া সেই বিশেষ আকারের মানুষের (চিত্র নং ৭) বা পশুর মূর্ত্তি ঐ হাড় খোদাই করিয়া ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু ভাস্কর-শিল্পের আদীম অবস্থায় প্রায় চার-পলার বেশী মুখ খোদাই করিয়া দেখাইবার উপযুক্ত সাধনা ছিল না (চিত্র নং ৪, ৪-ক, ৪-খ)। ক্রমশঃ, ভাস্কর্য্য শিল্পের উন্নতির সহিত স্বভাবের রূপের নানা অবয়বের অনুরূপ নানা মুখযুক্ত (many planes) মূর্ত্তির খোদাই করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণতঃ চতুষ্কোণ, বা চৌপলা কোনও কাষ্ঠের, বা পাথরের কেবল মাত্র চারটী মুখ, বা দিক (plane) থাকে। কিন্তু, চতুষ্কোণ যখন গোলাকৃতি করা যায়, তখন তাহার অসংখ্য অল্প পরিসরের ছোট ছোট মুখ (face, plane, surface) প্রকাশ (চিত্র নং ৩) পায়। সাধারণতঃ মানুষ বা পশুর অবয়ব নানা ডৌলে অসংখ্য মুখ (plane) যুক্ত রূপের সমষ্টি। মানুষের মুখ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পশুর অপেক্ষা অনেক বেশী অতি ছোট ছোট সূক্ষ্ম পরিসরের অসংখ্য, মুখ' (plane, face) দ্বারা নির্ম্মিত (চিত্র নং ৫, ৫-ক, ৬)। এই সমস্ত ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম মুখ—তীব্র আলোকে ডুবিয়া থাকে—অল্প আলোকের সূক্ষ্ম রশ্মিতে এই সব সূক্ষ্ম মুখ (plane) ফুটিয়া উঠে (চিত্র নং ৮, ৯)। এই জন্য উচ্চ অঙ্গের ওস্তাদ ভাস্করগণ তাঁহাদের চিত্র-গৃহে (Studio) নানা পর্দ্দা ঝুলাইয়া সূক্ষ্ম আলোক-পাতের বন্দোবস্ত করিয়া লন। ওস্তাদ শিল্পীরা এই ছোট ছোট রূপের ঢেউ দেখিবার সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ-শক্তি, বা দৃষ্টি বহু আয়াসে লাভ করিয়া থাকেন।

ভাস্কর্য্য-শিল্পের প্রকাশের তিনটী সাধন:—১। রেখা (drawing), ২। নানা পরিসরের মুখ, বা ক্ষেত্র (plane), এবং ৩। আলো ও ছায়ার অবকাশ (play of light and shade)। সমতল ক্ষেত্রের গর্ভে নানা রূপের নানা আকৃতির গহ্বর কাটিয়া নানা পরিসরের আলোকপাত করিতে পারা যায়, এইরূপ নানা বিচিত্র আকারের রূপের ঢেউ ভাস্কর তাহার কল্পিত মূর্ত্তিতে ফুটিয়ে
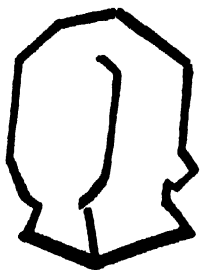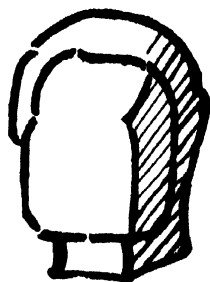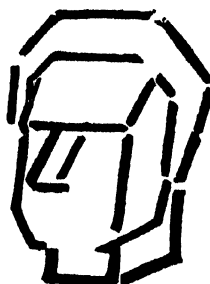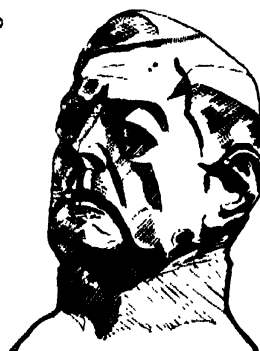
৪-ক
৪-খ
৬-ক
৫
৫-ক
৬
৭
৮
৬-গ

তোলেন। এই ছোট ছোট রূপের ঢেউ, এক একটী অক্ষর। এই অক্ষরমালা নানা ভঙ্গীতে নানা ছাঁদে গেঁথে, ভাস্কর তাঁহার ভাবপ্রকাশের শব্দমালা, বা অভিধান রচনা করেন।

রেখা দ্বারা ভাস্কর তাঁহার কল্পিত মূর্ত্তির সীমা নির্দ্ধারণ ও দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতার পরিমাপ নির্দ্দিষ্ট করেন। ক্রমশঃ, চার পলের খণ্ডকে নানা পল, বা বহু-মুখের (multi-plane) অবয়ব খোদাই করিয়া, তাঁহার কল্পিত রূপের প্রতিমা ফুটিয়ে তোলেন। কাঠ বা পাথরের খণ্ড হইতে, এইরূপে খোদাই করিয়া, মূর্ত্তির আদল বাহির করিয়া লইতে শিল্পীর বহুদিন লাগে। এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে, শিল্পীকে তাঁহার মানসিক কল্পনাকে মনের মধ্যে বহুদিন জাগ্রত রাখিতে হয়। পাষাণ বা কাষ্ঠের স্তম্ভের মধ্যে শিল্পীর কল্পিত বা আরাধিত প্রতিমূর্ত্তি নিহিত ও লুক্কায়িত আছে। তাহার বহিরাবরণের প্রচ্ছন্নতা হইতে পাথর কাটিয়া ভিতরের নিহিত মূর্ত্তিকে রূপ দিতে হয়। যে সব অনাবশ্যকীয় বস্তু দ্বারা কল্পিত মূর্ত্তিটী লুক্কায়িত আছে, তাহা খোদাই করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিলে, ভিতরের মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। এই হিসাবে ভাস্কর-শিল্পী লুক্কায়িত মূর্ত্তির আবরণ মোচন করেন মাত্র। জর্ম্মন শিল্পী ডুরার বলিয়াছেন "শিল্প-রূপ প্রকৃতির গর্ভে নিহিত আছে ; শিল্পীর কর্ত্তব্য এই রূপকে নিষ্কাষিত করা" (Art is hidden in Nature ; it is for the artist to drag her forth.")।

রেখা-বর্ণে লিখিত চিত্রের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে ভাস্করের মূর্ত্তি নানা অবয়বযুক্ত প্রতিমা। সুতরাং পুতুল, বা প্রতিমা অধিকতর বাস্তবিক ও চক্ষুর পক্ষে সত্য বস্তু। ভাস্করের খোদিত মূর্ত্তি আমরা চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করে, চারিদিক স্পর্শ করে, সত্যবস্তুর অনুরূপ অনুভূতি লাভ করি। ভাস্কর্য্যশিল্পের সাধন দ্বারা, প্রকৃতির রূপের হুবহু প্রতিমূর্ত্তি ভাস্কর গড়ে তুলতে পারেন। চিত্রের মায়া (illusion) অপেক্ষা ভাস্করের গঠিত পুতুলের মায়া (illusion) অধিকতর বাস্তবিক, (realistic অর্থাৎ অধিকতর চাক্ষুষ সত্যরূপ। (চিত্র নং ৬, ৬-ক, ৬-গ)।

অনেক সময় উপযুক্ত পরিসরের বস্তুর (material) অভাবে পূর্ণ অবয়বের (round) চারি-দিক থেকে দর্শনীয় মূর্তি রচনা করিতে না পারিয়া, অথবা অন্য কোনও কারণে, কেবল ফলক-মাত্র অবলম্বন করিয়া, ভাস্কর চিত্র নির্ম্মাণ করেন (চিত্র নং ১০, ১০-ক)। ইহাকে স্বল্পোদ্-ভিন্ন ফলক-চিত্র (bas-relief, low-relief) বলা যাইতে পারে। এইরূপ চিত্র বহুমুখী নহে, কেবল সম্মুখ দিক হইতে দ্রষ্টব্য। অনেক মন্দিরের গাত্রে বা প্রকোষ্ঠে, এই শ্রেণীর অল্প খোদিত ফলক (relief) নিবদ্ধ থাকে। প্রাচীন গ্রীসদেশের কবর বা শবাধারের উপরে এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর-চিত্রের উৎকীর্ণ নিদর্শন আছে। চীনদেশের অতি প্রাচীন ভাস্কর্য্যে ইহা অপেক্ষা অল্প গভীর উৎকীর্ণ-চিত্রের অনেক মনোহারী দৃষ্টান্ত আছে। হান্ যুগের শবাধারের গাত্রে, এই শ্রেণীর অতি ক্ষীণরূপে উদ্ভিন্ন ফলক-চিত্র পাওয়া গিয়াছে (চিত্র নং ১২)। এই শ্রেণীর খোদাইকে উদ্ভিন্ন ফলক (relief) না বলিয়া, কর্ষিত রেখাচিত্র (incised drawing) বলাই যুক্তি যুক্ত।

য়ুরোপের আদিম যুগের খৃষ্টান-শিল্পে, গজদন্তে উৎকীর্ণ উৎকৃষ্ট কল্পনার স্বল্প উদ্ভিন্ন ফলকের (bas-relief) নানা দৃষ্টান্ত আছে।

ইহা অপেক্ষা গভীর পরিসরের খোদিত ফলকে (Alto-relievo, high relief) ভাস্করের বক্তব্য কথা অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় বলিবার সুযোগ হয়। এই উচ্চ বা গভীর পরিসরের ফলকে দূরত্ব, ও বিষয়বস্তুর নানা বিবরণ ও খুটীনাটী খোদিত করিয়া দেখান যায়।

প্রাচীন এথেন্স্ সহরের পার্থেনন্ মন্দির হইতে আনীত ভাস্কর্য্য উচ্চ পরিসরের খোদাই শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন (চিত্র নং ১১)। প্রাচীন ভারতের শিল্পে স্বল্প-উদ্ভিন্ন ও উচ্চ পরিসরের খোদিত ফলক এবং চৌমুখ (sculpture in the round) ভাস্কর্য্যের নানা উৎকৃষ্ট নিদর্শন আছে।

১০

১১

১০-ক

১২

ভাস্কর্য্যের দোষ গুণ কেবল প্রকৃতির রূপের সাদৃশ্য বিচার করিয়া হয় না। ভাস্করের রূপ-কল্পনা তাহার রেখা সমষ্টির সঙ্গতি ও ঐক্যতানের (harmony of line) উপর এবং তাহার নানা পরিসরের ভার-সাম্যতার (balance of masses) উপর নির্ভর করে। চিত্রে অবশ্য রেখার অনেক মূল্য ও কথকতা (expressiveness) আছে,—ভাস্কর্য্যে রেখার মূল্য আরও বেশী। কারণ, নানা ছন্দে দীর্ঘ আলোক-পাতের উপর মূর্ত্তির রেখার তারতম্য ঘটে। মূর্ত্তিকারকে রেখার সমাবেশ ও সমন্বয় এরূপ কৌশলে করিতে হয়, যে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আলোক-পাতে তাঁহার রচিত মূর্ত্তি নূতন নূতন রূপ ও আকর্ষণের মোহিনী রূপ লইয়া প্রকাশ পাইবে। মূর্ত্তির নানা অবয়ব বা পরিসরের (masses) মধ্যে এমন সব সম্বন্ধ (relation) ঘটাইতে হয়, যে একাংশ অপরাংশের পূরক হইয়া একটী অন্যটীকে বল দেয়, শক্তি দেয়, উভয়ে যুক্ত হইয়া একটা সমগ্রতা (unity, totalism) গড়িয়া তোলে। মূর্ত্তির অবয়ব-সমষ্টির কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। প্রত্যেক অঙ্গ আর একটী অঙ্গের অপরিহার্য্য অংশ। এইজন্য ভারতীয় ভাস্কর্য্যের যোগরূঢ় ভাষায় মূর্ত্তির (sculpture) নাম 'স-কল' অর্থাৎ নানা অবয়ব বা কলাযুক্ত দ্রব্য। কলার সহিত বর্ত্তমান—'স-কল।'

এক দিক দিয়া, ভাস্করের প্রতিমা, নানা পরিসরের (masses) সুরে গ্রথিত রূপ-রচনা, ঘনমানের (depth) দিক হইতে, প্রতিমা আকাশ-জোড়া, যায়গা-জোড়া, অবয়বের (volume) সংস্থান, বা সমাবেশ (Sculpture is a "disposition of volume in space" (Malliol)।

কিন্তু চিত্র-শিল্পীও নানা পরিসরের খণ্ডাংশ (masses, areas) একত্র করিয়া একটা সুসম্বদ্ধ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া চিত্র রচনা করেন। ভাস্কর-শিল্পীকেও তাহার অনুরূপ পথে, মূর্ত্তি রচনা করিতে হয়। উপরন্তু ঘনমানের (depth) মধ্য দিয়া, তাঁহার রচনা ক্ষেত্র বা আকাশ (space) জুড়িয়া থাকে। সুতরাং গভীরতার দিক দিয়া ভাস্করকে আর একটা নূতন পরিসরের (dimension) মধ্য দিয়া, তাঁহার রচনা সার্থক করিতে হয়।

আধুনিক কালের মূর্ত্তি-শিল্পে বর্ণ-সংযোজনার রীতি প্রায় প্রচলিত নাই। প্রাচীনকালে, গ্রীসে ও রোমে, মূর্ত্তিকে বর্ণদ্বারা চিত্রিত করিবার রীতি ছিল। ভারতে মাটীর দেব-দেবীর মূর্ত্তিকে এখনও চিত্রিত করা হয়। কিন্তু প্রাচীন মন্দিরের গর্ভ-গৃহের দেব-দেবীর প্রতিমা প্রায়ই চিত্রিত করা হয় না। ভাস্কর্য্যে যে দিন হইতে বর্ণ-সংযোগের প্রথা রহিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভাস্করকে মূর্ত্তির অবয়বের স্পর্শনযোগ্য (tactile quality) রূপ ফুটাইবার চেষ্টা চলিয়াছে। কল্পিত মূর্ত্তির দেহে, মসৃণ অথবা রুক্ষ এইরূপ নানা অনুপাতের স্পর্শানুভবতার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। পাথরের কতক অংশ মাজিয়া পালিশ ও মসৃণ করিয়া এবং কতক অংশ রুক্ষ ও পরুষ রাখিয়া, বিভিন্ন অংশে একটা বিপরীত রসের (contrast) সৃষ্টি করিয়া, মসৃণ অংশকে অধিকতর মসৃণ ও মৃদুল, এবং রুক্ষ অংশকে অধিকতর রুক্ষ ও পরুষতার ভাব দিবার একটা কৌশল ওস্তাদ শিল্পীরা প্রয়োগ করেন এবং বিপরীত ও বিবাদী রসের ঘাত প্রতিঘাতে মূর্ত্তিকে অভিনব ভাবে উজ্জীবিত করিবার পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। ফরাসী ভাস্কর রোদাঁ এই বিপরীত রসের প্রয়োগে অদ্ভুত কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন (চিত্র নং ১৩)। ভাস্কর-শিল্প হইতে বর্ণ-যোজনার প্রথা রহিত করিয়া, শিল্পীরা প্রতিমা রচনাকে রেখা ও আলোক পাতের দুইটী মাত্র সাধনে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। এইজন্য ভাস্কর-শিল্পে, রেখা-যোজনা রেখা-সমাহার অধিকতর দায়িত্বের ব্যাপার। কেবল রেখার সূক্ষ্মপাতে গঠনের গোলাল ভাব ও মাংসপেশীর মৃদুলতা কৌশলে দেখান যায়। ভারতে পহ্লবযুগের দুই একটী উচ্চমানের খোদিত প্রস্তরফলকে ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। (চিত্র নং ১৪)।

সুতরাং এই রেখা রচনা ও সংস্থানের মধ্যে বহুল পরিমাণে ছন্দ প্রকাশের নানা সুযোগ ও দায়িত্ব আছে। এইজন্য, চিত্র-শিল্পের মত ভাস্কর্য্য-শিল্পেও ছন্দ-রচনা (Rhythm) একটী অপরিহার্য্য উপাদান ও সাধন। প্রতিমা-রচনায় রেখাসংস্থান ছন্দের ভঙ্গীতে, ছন্দের তালে, সুনিবদ্ধ করিতে না পারিলে, রেখা একটা চক্ষু-পীড়ার কারণ হয়। সাঞ্চী স্তূপের নানা আলঙ্কারিক

১৩

১৪

১৫
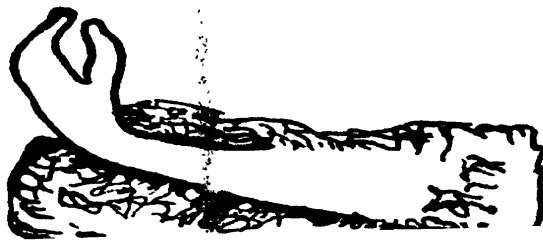
নক্সায়, খোদাই শিল্পে, ছন্দের প্রয়োগের অতি নিপুণ ও চিত্তহারী উদাহরণ আছে। নানা পদ্ম ফুলের আলম্বনের মধ্য দিয়া, তাহার চক্রাকারকে নানারূপে বেষ্টন ও আবদ্ধ করিয়া, তির্য্যক গতিতে, পদ্মের মৃণাল আঁকা বাঁকা পথে ছন্দের তালে তালে নমনীয় মৃণালের ক্ষীণ যষ্ঠি আপনার গতির বাঁকে বাঁকে আপনাকে ছন্দের গতিতে প্রসারিত করিয়াছে (চিত্র নং ১৫)। মন্দিরের নানা আলঙ্কারিক পরিকল্পনার রচনায়, ভাস্কর-শিল্পের নানা প্রয়োগ দেখা যায়। এই সব ভূষণের রেখা সংস্থানে ছন্দের লীলা-গতির অনেক চিত্তহারী নিদর্শন আছে। আমেদাবাদের বাদসাহী সমাধি-মন্দিরে শ্বেত পাথরের জালীকাটা গবাক্ষে রেখা-বিন্যাসের অদ্ভুত ছন্দলীলার উদাহরণ আছে। (চিত্র নং ১৬)।

ভারতের প্রাচীন দেব-দেবীর কাল্পনিক মূর্ত্তির রেখা-কল্পনায় ছন্দ-গতির নানা রমণীয়, দৃষ্টান্ত আছে। দক্ষিণদেশের ভেলুর মন্দিরের গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া একটী প্রভা তোরণ কল্পিত হইয়াছে (চিত্র নং ১৭)। একটী পদ্মের মৃণালের শাখা —পাদ-পীঠের মকরের শুণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া, আঁকা বাঁকা পথে, দেবীর মৃণাল ভুজের মধ্য দিয়া, আর একটী নূতন বক্র-গতিতে উপরে উঠিয়া, মাথার উপর একটী সুন্দর বর্ত্তুলাকার তোরণ (arch) রচনা করিয়া দক্ষিণ হস্তের রেখার সহিত মিলিয়া, আবার বাঁকা পথে নিম্নের দিকে জল-প্রপাতের সুমিষ্ট ধারার মত, পদ্মকোরকের রূপ লইয়া, স্বচ্ছন্দগতিতে ছন্দের তালে নাচে নামিয়াছে। ভাস্কর্য্যে ছন্দলীলার গতির এটী একটী শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

ভাস্কর্য্য-শিল্পে আর একটী বিশিষ্ট রসের প্রকাশের বিশেষ সুযোগ আছে—এটী হ'ল স্থির রস বা শান্তি রস (Repose)। নানা রেখার গতি-চাঞ্চল্যের মধ্যে, নানা পরিসরের (mass), নানা অবয়বের (volume) ভার-সাম্যের (balance) মধ্য দিয়া, ভাস্কর একটী মধুর রস ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন—এটী হল এই স্থির ভাবের শান্তিরস (repose)। এই স্থৈর্য্য, এই গতিহীনতার স্তব্ধতা নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার, নানা চঞ্চলতার সমন্বয় করিয়া, তাহাদের বিপরীত গতিকে

১৬

১৭
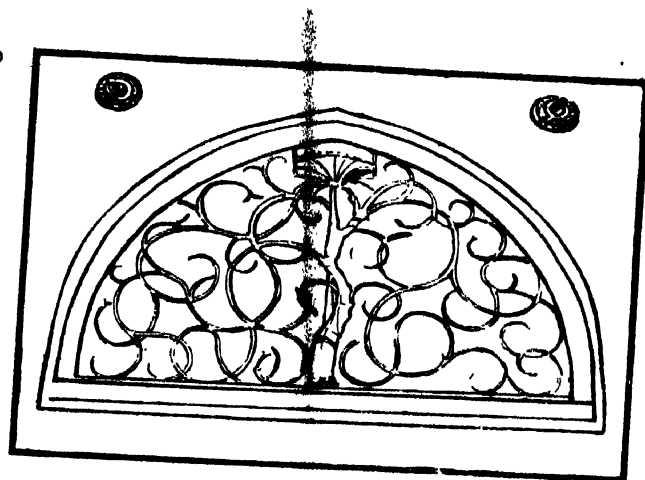
কেন্দ্রগত (equilibrium) করিয়া, একটা মধুর ঐক্যতানে পর্য্যবসিত করেন নিপুণ ভাস্কর। এই গতিহীনতার সুস্থির রস (repose) প্রাচীন গ্রীসদেশের ভাস্কর্য্যে (চিত্র নং ১৮), এবং তাহার অনুকরণে ইতালীয় প্রতিমাশিল্পে, (চিত্র নং ২০) নানা উদাহরণ আছে। ভারতের নানা দেবী-প্রতিমায় এবং গথিক যুগের খৃষ্টান প্রতিমূর্ত্তিতে ইহার অনেক সুন্দর নিদর্শণ পাওয়া যায়। ভারতের 'ধ্যানী-বুদ্ধ,' 'প্রজ্ঞাপারমিতা' প্রভৃতি নানা অলৌকিক মূর্ত্তি কল্পনায় (চিত্র নং ১৯), তাহার অনুরূপ শান্তিরসের প্রতীক, পৃথিবীর আর কোনও দেশের শিল্পে বিরল। চীনদেশের প্রতিমূর্ত্তি, ভারতীয় সাত্বিক রসের প্রশান্ত ভাবের রূপ-কল্পনার ধারা অনুসরণ করিয়াছে। কবিরা এই স্থির ভাবের শান্তিরসের মূর্ত্তিকে বায়ুহীন স্থানে কম্পহীন দীপশিখার সহিত তুলনা করিয়াছেন। ("নির্বাত নিষ্কম্প ইব প্রদীপম্।")

পাথর কিম্বা কাঠের উপাদানে, গতিহীনতা বা স্থির রসের মূর্ত্তি রচনা যত সহজ, চলমান ত্বরিত গতির ভাব (movement) প্রকাশ করা, তত সহজ নহে। অথচ ওস্তাদ মূর্ত্তিকারক, যুগে যুগে, নিশ্চল পাথরে খোদাই করা, নানা কল্পিত-মূর্ত্তিতে গতি ও চঞ্চলতার নানা ছন্দময় প্রতীক রচনা করিয়াছেন। পার্থেননের উদ্দামগতির অশ্বচিত্র (চিত্র নং ১১) ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। নিশ্চল উপাদানে গতির চাঞ্চল্য চিত্রিত করা দুরূহ ব্যাপার। এই জন্য, শিল্পীকে গতির নানা ভঙ্গী, নানা মূর্ত্তির মধ্য হইতে এমন একটী বিশেষ গতিরূপ চয়ন করিয়া লইতে হয়, যাহাদ্বারা গতির যথার্থ রূপ বাস্তবিক বলিয়া মনে হইবে। গতির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলমান মূর্ত্তিটী নানা বিভিন্ন ভঙ্গীর রূপের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলে। এই নানা ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটী চলিষ্ণু মূর্ত্তিকে বাছিয়া লইতে হইবে, যাহার মধ্যে এই গতিবেগের বীজ তীব্ররূপে নিহিত আছে। ঢেউ যখন তার সমতল রেখার খোল ছেড়ে, বাঁকা রেখায় উপরের দিকে উঠে, তখন উচ্চ চূড়ায় (crest) উপস্থিত হইয়া, এক মূহুর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়ায়। এই স্থির ভাবের মধ্যেও তাহার চলিষ্ণুতার বীজ বা শক্তি থাকে, কারণ তখনও তাহার গতি-শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই— নীচের দিকে নামিয়া

১৮

১৯

২০
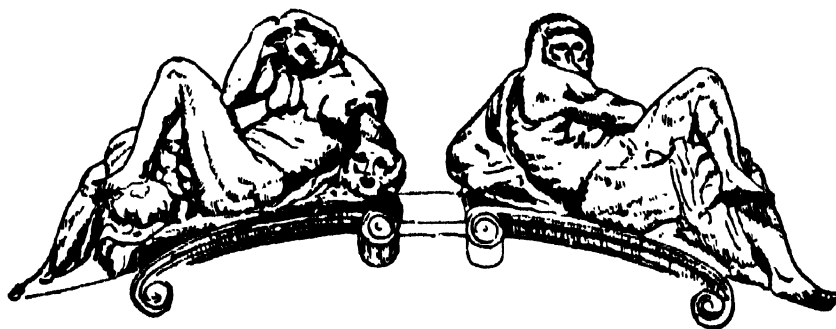
আসিবার বেগ (momentum) তখনও তাহার মধ্যে আছে। উপরে উঠিয়া গতির একটা ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, নীচে নামিবার দ্বিতীয় অধ্যায় এখনও বাকী আছে। চীন ও জাপানী শিল্পীর লহর-চিত্রে এই গতিলীলার রহস্য বেশ স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। (চিত্র নং ৮০)।

গ্রীক শিল্পী মাইরণের কল্পিত বিখ্যাত "চক্র-নিক্ষেপের" মূর্ত্তিতে (Discobolus-Disc-thrower) এই গতিশীল মূর্ত্তির বেগ ধারণের সার্থক মুহূর্ত্তটী (dynamic moment) অতি নিপুণ কৌশলে প্রকাশিত হইয়াছে। (চিত্র নং ২১)।

আর একটী অতি-প্রসিদ্ধ মূর্ত্তিতে গতির (movement) চঞ্চলতা নিশ্চল পাষাণের রূপে প্রকটিত হইয়াছে (চিত্র নং ২২)। এটী হল গ্রীক ভাস্কর্য্যের অবনতির যুগের কল্পনা অতি প্রসিদ্ধ "লা-কোঅন্"। এটী একটী বলিষ্ঠ মানুষের একটী অজগর সাপের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধের চিত্র। এই মূর্ত্তিত্রয়ে উদ্দাম চঞ্চলতার বাস্তবিক চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই মূর্ত্তি-চিত্রে, এই তিনটী মূর্ত্তির নানা গতি ও ভঙ্গীমালার মধ্যে, কোনও ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা নাই। এমন কোন একটী বিশেষ কেন্দ্র নাই যেখানে ইতস্ততঃ প্রেরিত চক্ষু একটু সুস্থির হইয়া দাঁড়াইবার সুযোগ পায়। এখানে যেন আমাদের চক্ষু কল্পিত মূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানা ঘূর্ণীপাকে বিক্ষিপ্ত হইয়া, ইহার গতি-চক্রের সহিত একযোগে ঘুরিতে থাকে! গতি ও স্থিতি দুটা আপেক্ষিক (relative) বস্তু। আমি স্থির হইয়া না বসিলে, অন্য বস্তুর গতি-চাঞ্চল্য অনুভব করিতে পারি না। রেল-গাড়ীতে চাপিলে জান্‌লার মধ্য দিয়া নিশ্চল বস্তুর সহিত তুলনা না করিতে পারিলে, আমরা চলমান গাড়ীর গতি অনুভব করিতে পারি না। কারণ, গাড়ীর গতি আরোহীকেও গতি দেয়। স্থিতির ভাব চক্ষের সম্মুখে না থাকিলে, আমরা ঠিক গতির ভাবটী সম্যক অনুভব করিতে পারি না। গতির তুঙ্গ অবস্থায় ক্ষণিকের স্থিতির অবসর আছে, যেমন উচ্চ শৃঙ্গের কাঁধে সমুদ্রের ঢেউ, মূহূর্ত্তের জন্য স্থির ভাবে থাকে। গতি বেগের এই স্থির মূহূর্ত্ত বাস্তবিক নিশ্চলতা নহে—দুইটী শক্তির বিরোধের

২১
২২
২২-ক
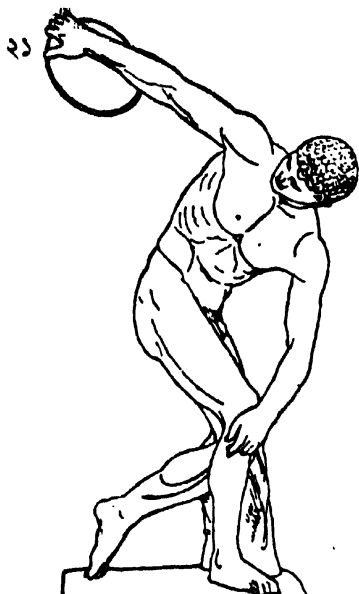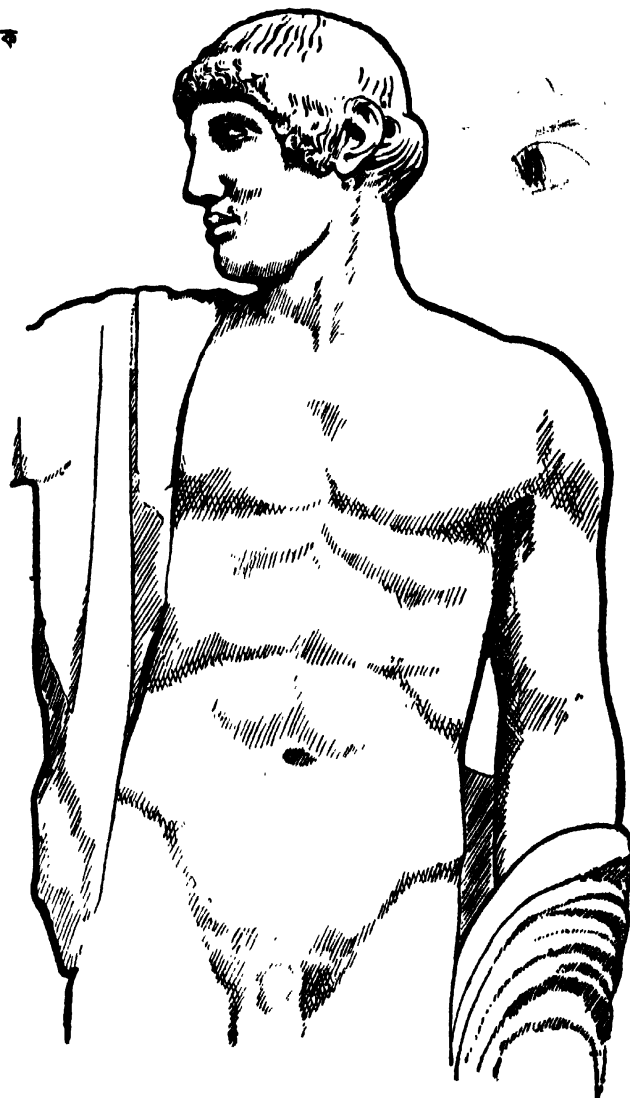
মধ্যে সাময়িক গতিহীনতা। এই গতির মধ্যে স্থিতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ভারতীয় প্রতিমাকারের অপূর্ব্ব কল্পনা—"নটরাজের" প্রতিমায় রসের মূর্ত্তিতে চিত্রিত হইয়াছে (চিত্র নং ২৩, ২৪)। গতির ঘূর্ণীপাকে আত্মবিস্মৃত হইয়া "কাল-পুরুষকে" নৃত্যের ছন্দে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, একটা ব্রহ্ম-সূত্রের (axis) অবলম্বনে মূর্ত্তিটী লাটিমের নিদ্রিত গতির মত চক্রাকারে ঘুরিতেছে (gyrating); হঠাৎ দেখিলে ভ্রম হয় যেন মূর্ত্তিটী স্থির মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। কিন্তু হস্ত পদের ইতস্ততঃ ধাবমান চঞ্চল চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারি, যে নৃত্যের গতির বেগে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কেন্দ্র হইতে (axis) বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই বিক্ষেপের সঙ্কেতে গতির চিত্র সূচিত হইয়াছে। আমাদের শৈশবের পুতুল "তাল পাতার সেপাই" অনুরূপ গতিছন্দের বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। (চিত্র নং ২৫)।

পশ্চিমদেশের অনেক শিল্পী এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, যে ভাস্কর-শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষের মূর্ত্তির শ্রেষ্ঠ আদর্শের রূপ রচনা করা। প্রাচীন গ্রীসে ভাস্কর্য্যের এই আদর্শই সার্থক হইয়াছে। গ্রীক সাধনার আগে কিম্বা পরে, কোনও দেশের শিল্পীই মানব দেহের দিব্যশ্রী, সুষমা, ও লালিত্য এমন সুন্দর করে, এমন মনোহারী করে, পটে কি শিলায় ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন নাই। মানুষের দেহের শ্রেষ্ঠ কল্পনার সৌন্দর্য্যের অপরূপ চিত্রটী, কেবল গ্রীক শিল্পীর দিব্যদৃষ্টিতেই ধরা দিয়েছিল। (চিত্র নং ২২-ক)।

২৩
২৪
২৫
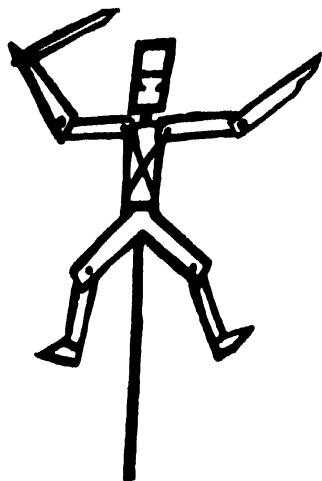
অস্থি-বিজ্ঞান

(ANATOMY)

মানুষের দেহের সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি কাঠে কিম্বা পাথরে গড়ে তুল্‌তে হলে, শিল্পীর পক্ষে মানুষের দেহের অস্থি, মাংস-পেশীর ও শিরা উপশিরার একটা সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই জ্ঞান লইয়া, এই অস্থিবিদ্যার বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া, ভাস্কর্য্য-শিল্পের উৎকর্ষ কিরূপ সিদ্ধ হয়, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। গ্রীক সাধনার শ্রেষ্ঠযুগে ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যার বিশেষ চলন ছিল না। গ্রীক ভাস্করগণ যে অস্থি-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহার কোনও পরিচয় আজও পাওয়া যায় নাই। অস্থি-বিদ্যা অধ্যয়ন না করিয়াও গ্রীসের শ্রেষ্ঠশিল্পী মানুষের দেহের যে অলৌকিক প্রতিমা গড়িয়াছেন অস্থিবিদ্যায় পারদর্শী পরের যুগের কোনও শিল্পী তাহার নিকটে পৌঁছিতে পারেন নাই।

একথা অবশ্য সত্য যে অস্থিবিজ্ঞান ও মাংসপেশীর ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকিলে, মনুষ্য দেহের গতি ও লীলাভঙ্গীর রহস্য অনেকটা বুঝা যায় এবং মাংসপেশীর গতি ও প্রক্রিয়ার ধারণা থাকিলে, গতি ও চাঞ্চল্যের প্রতিরূপ সুষ্ঠুরূপে প্রতিমাশিল্পে ফুটাইয়া দেখান যাইতে পারে। অস্থিবিজ্ঞানের আর একটা আবশ্যকতা এই যে মনুষ্যদেহের নানা অঙ্গ ও অবয়বের আপেক্ষিক পরিমাণ (proportion) ও বিভাগের পরিমাপ জানা যায় এবং পরিমাণ জ্ঞানদ্বারা অতি সহজে

চোখে দেখার চাক্ষুষ মূর্তিকে পরিমাপের সূক্ষ্ম বিভাগে ও চক্ষুর তৃপ্তিকর তালমানে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিবার সুবিধা হয়। গ্রীকভাস্করের পরিমাণ জ্ঞান জগতে অতুলনীয় (চিত্র নং ২৬)। Proportion, বা তালমান ভাস্করশিল্পের একটী বিশিষ্ট অঙ্গ। মূর্তির সৌন্দর্য্য ও গতিভঙ্গীর রমণীয়তা এই অঙ্গবিভাগের সঠিক পরিমাণ ও মাত্রাজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সাধারণ সুস্থকায় মানুষের দেহের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ও অঙ্গবিভাগের পরিমাণ লইয়া মানুষের প্রতিমা গড়িবার একটা মাপ-কাটী (measure) অবলম্বিত হয়। ইতালীর ভিট্রুভিয়াস এইরূপ মাপ-কাঠির উপর মনুষ্যদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ করিয়া নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন (Canons of proportion)। ভারতের শিল্পশাস্ত্রেও এই মাপ-কাঠীর তালমান নির্দ্ধারিত আছে। দোরিফোরাস্ নানা মানুষের দেহ মেপে ঠিক করেছিলেন যে মানুষের মুখের আটগুণ তাহার দেহের দৈর্ঘ্য (চিত্র নং ২৭)। একে বলে 'আট মুণ্ডের নিয়ম' (Law of eight heads)। ভারতবর্ষের ভাস্কর-শিল্পীরা একে 'অষ্টতালের' মান বলে থাকেন। কেবল এই সাধারণ স্বাভাবিক অষ্টতালের পরিমাপের আদর্শ অবলম্বন করে, তাঁরা অতিমানুষের দৈর্ঘ্য উচ্চমানে কল্পিত করেছেন। দেব-দেবীর মূর্ত্তি 'দশতাল মানে,' অর্থাৎ মনুষ্যমূর্ত্তির দুইমান উপরে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

মধ্যযুগের ইতালীর শ্রেষ্ঠশিল্পী ও বৈজ্ঞানিক মাইকেল এন্‌জেলো ব্যবচ্ছেদবিদ্যার সাহায্যে মানুষের দেহের অস্থি, ও মাংসপেশীর নানা সূক্ষ্ম পরিমাণ ও সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া নানা চিত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন (চিত্র নং ২৮, ২৯)। ইহা দ্বারা মানুষের শরীরের গঠন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আপেক্ষিক পরিমাণ (relative proportion) সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য পরিস্ফুট হইয়াছে (চিত্র নং ২৭-ক, ২৭-খ)। কিন্তু দেহের বা অবয়বের বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর শিল্পের রূপতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে। শিল্পরূপের চাক্ষুষ ব্যবহার-রূপের বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া শিল্প রচনা করা যায় না। কল্পনার দ্বারা রূপান্তরিত রূপই শিল্পের রস-রূপ। তাহার সন্ধান

২৬

1
2
3
4
5
6
7
8

২৭

২৭-ক

1
2
3
4
5
6
7
8

২৭-খ

(Deltoid)
Collar
Triceps
Supinator
Line of groin
(External oblique)
Adductors
Thigh-strap (Sartorius)
Soleus

বৈজ্ঞানিক পথে পাওয়া যায় না, কল্পনার পথে তাহাকে অনুসন্ধান করিতে হয়। ব্যাকরণের নিয়ম কণ্ঠস্থ করিলে যেমন বড় কবি হওয়া যায় না, সেইরূপ অস্থি-বিদ্যার নিয়ম মুখস্থ করিলেই বড় ভাস্কর হওয়া যায় না। ইতালীর আর একজন বড় শিল্পী বলেছেন ("Learn Anatomy and then forget it) : 'অস্থিবিদ্যা শিখে নাও তাহার পর বিস্মৃতির গর্ভে ঢেলে দাও'।

অস্থিবিদ্যার জ্ঞান শিল্পীকে মূর্ত্তিরচনার একটা মধুর উপাদান দিয়েছে—এটী হল ভাবের আবেশে দেহের নানা সুন্দর 'ভঙ্গের' (flexion) কল্পনা (চিত্র নং ৩০, ৩০-ক)। মানুষ যখন স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তখন কখনও দুই পায়ের উপর সমান ভার রেখে দাঁড়ায়, কখনও এক পায়ের উপর সমস্ত ভর দিয়ে দাঁড়ায়। এস্থলে আর একটী পা, ভারমুক্ত হয়ে, আপনার ইচ্ছামত ভঙ্গীতে ন্যস্ত হয়। এই দেহভঙ্গের বিভিন্ন ভঙ্গীতে, দেহ নানা সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়। অবস্থা অনুসারে ও ভাবের প্রেরণায়, শিল্পী তাহার কল্পিত রূপকে বিভিন্ন 'ভঙ্গে' বিভক্ত করিয়া নূতন নূতন রসের সৃষ্টি করেন। মাথার মধ্য দিয়ে সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া (axis) যদি সূত্র (plumb-line) ফেলা যায়, তাহার দ্বারা শরীর সমান ভাবে বিভক্ত হয়। যদি সমান ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়. তখন দুই পায়ের উপর ভার সমান ভাবে পড়ে (চিত্র নং ৩১)। এই ভঙ্গের নাম 'সমপাদ ভঙ্গ'। যদি ব্রহ্মসূত্রের (axis line) এক পাশ হইতে অন্য পাশে অবয়বগুলি বেঁকে যায়, তখন এক পায়ের উপর ভার পড়ে, ইহার নাম "আভঙ্গ" বা "ঈষৎ-ভঙ্গ"। (চিত্র নং ৩২)।

যদি দেহযষ্টি তিনটী বিভিন্ন 'ভঙ্গে' বিভক্ত হয়, তাহার নাম 'ত্রি-বঙ্ক' বা 'ত্রি-ভঙ্গ'। গ্রীক ভাস্কর্য্যেও এই 'আভঙ্গের' অতি সুন্দর ও সুমধুর নিদর্শন আছে (চিত্র নং ৩৩)। ভঙ্গী ভাস্করের প্রতিমার প্রাণ স্বরূপ। শরীরভঙ্গীকে সুন্দর ঠাটের রূপ দিতে পারিলেই তাহা শ্রেষ্ঠ প্রতিমায় পরিণত হয় (Sculpture is a fine gesture attitudinized)।

—তেরো—

৩৩

পূর্ব্বদেশের ভাস্করশিল্পীরা আপনাদের মূর্ত্তিকল্পনাকে অস্থিবিদ্যার আইন ও পরিধির দ্বারা সীমাবদ্ধ করেন নাই। স্বভাবের পরিচিতরূপে যে সব আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, পরিশুদ্ধ (refine) করিয়া, এবং মানুষের স্বাভাবিক আকৃতি অবয়বকে অতিক্রম করিয়া, এক নূতন আদর্শের, এক নূতন কল্পনার রমণীয় প্রতিমা এদেশের ভাস্কর গড়িয়া তুলিয়াছেন, যাহা চোখেদেখা মানুষের মূর্ত্তির হুবহু অনুকরণ নহে। এক হিসাবে ইহা নূতন সৃষ্টি। এই কাল্পনিক পন্থায় মানুষের অবয়বের যে সব দোষত্রুটী চোখের পীড়াদায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, তাহাকে বর্জ্জন করিয়া, লুক্কায়িত করিয়া, একটা উচ্চতর আদর্শের কাল্পনিকরূপের সৃষ্টি করা পূর্ব্বদেশের ভাস্করের উদ্দেশ্য। তাহারা মানুষের মূর্ত্তি অতিক্রম করিয়া, একটা অতিমানুষের আদর্শের কাল্পনিকরূপ গড়ে তুলেছেন। ভারতের শিল্পীদের কল্পিত দেব-দেবীর মূর্ত্তিতে একটা নূতন পর্য্যায়ের, একটা উন্নততর, একটা সূক্ষ্মতর, একটা সুন্দরতর মূর্ত্তিকল্পনার আভাষ আছে। গ্রীকদেশের দেবতার কল্পনা ব্যায়ামশালার বলিষ্ঠ মনুষ্যদেহের উপর প্রতিষ্ঠিত (cf. Zeus, চিত্র নং ৩৩) ভারতের দেবতার কল্পনা মনুষ্যদেহের আদর্শের অনুসরণ নহে, অতিমানুষের আদর্শের ধ্যান-লব্ধ কল্পনা। গ্রীসের ভাস্করের আদর্শ, দৈহিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ; পূর্ব্বদেশের আদর্শ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ।

পূর্ব্বদেশের ভাস্কর্য্য-রীতিতে আর একটা বিশেষত্ব আছে। ভারতের ভাস্করগণ দাবী করেন তাঁহারা বিশ্বকর্ম্মার পুত্র, ব্রহ্মার পৌত্র। সুতরাং, সৃষ্টি করিবার স্বাধীনতা তাঁহাদের আছে। তাঁহাদের শিল্পকল্পনা কেবল পৃথিবীর পরিচিতরূপেই আবদ্ধ থাকিবে না। রেখা ও রূপকে (line and form) অক্ষরমাত্র অবলম্বন করিয়া, নূতন নূতন আদর্শের রূপসৃষ্টি করিবার অধিকার ও নিপুণতা তাঁহাদের আছে। যাহা কেহ কখনও চোখে দেখে নাই, এইরকম সব অপরূপ ও দিব্যরূপ তাঁহারা কল্পনার বলে সৃষ্টি করিতে পারেন। এবং এই শ্রেণীর নূতন রূপসৃষ্টি, আসল

শিল্পীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে দেখিতে পাই, ভারতের শিল্পী অদ্ভুত আদর্শের 'গণেশের' মূর্ত্তি, 'নরসিংহের' মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। প্রাচীন মিশর দেশের "সেখ্ মেটের" সিংহের মুখ-যুক্ত নরদেহের কল্পনা, (চিত্র নং ৩৪) ভারতের "নরসিংহ" কল্পনার অনুরূপ সৃষ্টি। এই শ্রেণীর অভিনব রূপসৃষ্টির দোষগুণ বিচার কর্ত্তে হবে, তাহাদের অঙ্গ ও অবয়বের বিন্যাস ও পরিমাপের নৈপুণ্যের বিশ্লেষণ করে, তাহাদের অন্তর্নিহিত রেখাসমষ্টির সঙ্গতি ও মাধুর্য্যের বিশ্লেষণ করে। মূর্ত্তিটী স্বভাবের কোনও পরিচিত রূপের সহিত মেলে কিম্বা মেলে না, তাহার আদর্শে এই শ্রেণীর নূতন রূপসৃষ্টির বিচার হতে পারে না। চীন ও জাপানের নানা প্রতিমায় এই শ্রেণীর অভিনব রূপের মৌলিক কল্পনার নানা নিদর্শন আছে। য়ুরোপের গথিক যুগের শিল্পে ও গ্রিফিনের মূর্ত্তিকল্পনায় এইরূপ নূতন পর্য্যায়ের রূপসৃষ্টির দৃষ্টান্ত আছে।

পশুমূর্ত্তির কল্পনাতেও এই নূতন রীতির মৌলিক রূপসৃষ্টির অবসর আছে। আসীরিয়ার "বৃষ-মানুষ" (চিত্র নং ৩৫) ভারতের "গরুড়"-মূর্ত্তি, দক্ষিণ দেশের 'যালী' (চিত্র নং ৩৬) ও শার্দ্দূলের কল্পনা, পরিচিত পশুমূর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়া, নানা বিচিত্র রসের, নানা অলৌকিক আদর্শের শিল্পসৃষ্টি। চীনদেশের "ড্রাগন" (চিত্র নং ৩৭) আর একটী মৌলিক রূপ-সৃষ্টি। চীনদেশের Tao-Tieh (বা কীর্ত্তিমুখ) আর একটী অদ্ভুত আদর্শের অভিনব রূপকল্পনা। এমন কি গ্রীক দেশেও যেখানে শিল্পী মানুষের সুমিষ্ট আকারের দেহকেই শিল্পকল্পনার সীমা বলিয়া সাধারণভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, সে দেশেও কখন কখন শিল্পীরা প্রকৃতির পরিচিত রূপকে অতিক্রম করিয়া অভিনব ও অপরূপ রীতির রূপসৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত "গর্গন ও মেডুসার" মূর্ত্তি এবং পশু ও মানুষের রূপের সমন্বয়ে গঠিত "সেটার" (Satyr) (চিত্র নং ৩৮) ও প্যানের (Pan) অপরূপ কল্পনা।

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

ভাস্করের রূপকল্পনা কেবলমাত্র পরিচিত মানুষের বা পশুরচিত্রেই নিবদ্ধ নহে। তাহার রূপের জগৎ অতি-বিস্তৃত কল্পনার জগৎ, যাহার অতল রূপসমুদ্রে এমন সব নূতন গঠনের, নূতন আকারের, নূতন পর্য্যায়ের রূপের আদর্শ লুক্কায়িত আছে, যাহা এখনও পর্য্যন্ত মানুষের চোখের সামনে উপস্থিত হয় নাই। ভাস্করশিল্পী মধ্যে মধ্যে তাঁহার কল্পনার রূপসাগরে অবগাহন করিয়া, নূতন নূতন রূপরত্ন তুলিয়া আনিয়া, আমাদের চোখের সামনে বাস্তবিকতার রূপ দিয়া প্রকাশ করিয়া চিত্রিত করেন।

পাথর, কাষ্ঠ, বা গজদন্ত ব্যতীত আর দুইটী উপাদানে ভাস্কর তাঁহার অন্তরের কল্পনাকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া থাকেন। একটী হল মাটী (terra cotta) আর একটী পঞ্চ-লৌহ (bronze) অথবা অন্যান্য ধাতু (metals)। যেখানে উপযুক্ত পাথরের অভাব, সেখানে পোড়া মাটীর উপাদানে শিল্পীরা চিত্তহারী মৃণ্ময় মূর্ত্তি গড়েছেন। পাথর প্রচলন হবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, আদীমশিল্পীরা কেবলমাত্র অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া, নমনীয় মাটীকে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে, সুন্দর রূপের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বেশীভাগ, আকারে ক্ষুদ্র, পোড়ামাটীর মূর্ত্তিরচনায় নূতন ভাব ও রসের কল্পনার অবসর আছে। ইহার গঠনরীতি (technique) ও পদ্ধতি স্বতন্ত্র। আদীমযুগের সহজ সরল শিশুভাব এই সব ক্ষুদ্র আকারের মৃত্তিকা চিত্রে কুশলশিল্পীর কুশলকল্পনায় লিপিবদ্ধ আছে। (চিত্র নং ৩৯)।

অষ্ট্রীয়াদেশে, একটী স্থূল অবয়বের বর্ত্তুলাকারে বক্র রেখায় কল্পিত "জগদম্বার" প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র নং ৪০)। প্রতিমাটী আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু মাতৃকা ভাবের—বিশালত্ব ও বিরাট কল্পনা এই নগণ্য অথচ ভাবসম্পদে সম্পূর্ণ মাতৃমূর্ত্তিতে নিহিত আছে। ইহার বয়স ২৫০০০ বৎসর। ইহার কিছু অনুরূপ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোডারোর প্রাচীনক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে বাঁকা রেখা অপেক্ষা সহজ সরল রেখার প্রাধান্যই বেশী। বাহ্যিক সৌন্দর্য্য কিম্বা কলমের কারিগরী এই শ্রেণীর মূর্ত্তিতে অন্বেষণ করা মূঢ়তা। ভাবের গভীরতায় (depth) ও একনিষ্ঠতায় (intensity) এই শ্রেণীর মৃত্তিকা মূর্ত্তি অতুলনীয়।

৩৯

৪১

৪০

৪২
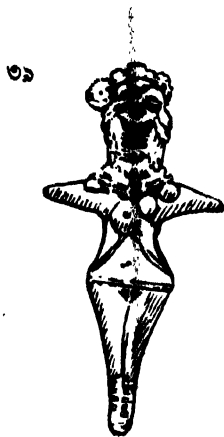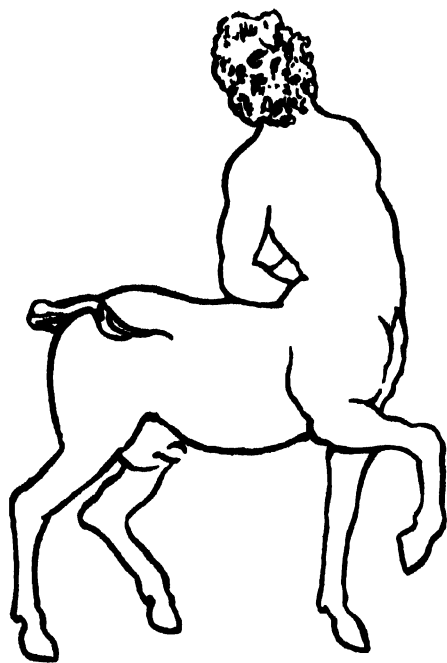
প্রাচীন গ্রীসদেশের Tanagraর ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র পরিসরের অসংখ্য মাটীর মূর্ত্তি (terra cotta) আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাথরের মূর্ত্তির তুলনায় ইহাদের আদর্শ ও কল্পনা স্বতন্ত্র।

চীনদেশেও এই পোড়ামাটীর প্রস্তুত অপরূপ কল্পনার নানা ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি অতি প্রাচীন যুগের। গাম্ভীর্য্যে ও অল্পপরিসরে অনেক কথা বলিবার শক্তিতে, চীনের প্রাচীনযুগের মৃণ্ময়প্রতিমা জগতে অদ্বিতীয়। ধাতুর মূর্ত্তি অনেক সময় পাথরের মূর্ত্তি অপেক্ষা অধিক স্থায়ী। শিল্পীরা ধাতু অবলম্বন করিয়া নানা মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতে যেমন অষ্টধাতুর দেব-দেবীর মূর্ত্তি রচনার প্রচলন আছে, প্রাচীন গ্রীসে ঐরূপ একাধিক নানা ধাতুর মিশ্রণে ব্রোঞ্জ ধাতুর দ্বারা প্রতিমারচনার প্রথা ছিল। সীসা, তামা, পিতল, রৌপ্য ও টীন মিশ্রিত করিয়া এই ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত হইত। ডেলফির সুপ্রসিদ্ধ অশ্বচালকের ধাতুমূর্ত্তির মুখমণ্ডল দেবতার দিব্যসৌন্দর্য্যে দীপ্যমান (চিত্র নং ৪১)। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মের 'নিদ্রাদেবীর' ধাতু-মূর্ত্তি (Hypnos) গ্রীকপুরাণের মধুরকল্পনাকে ধাতুর উপাদানে অমর করিয়া রাখিয়াছেন—একজন অজ্ঞাত গ্রীক প্রতিমাকার (চিত্র নং ৪২)। শ্বেত-পাথরের আলো ও ছায়ার যে বিপরীত ও সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব রসের (contrast) অবসর আছে ঘন সবুজ, বা কৃষ্ণাভ বর্ণের ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তিতে তাহার অবকাশ নাই। গভীর শ্যামবর্ণের আবরণে গঠনের কারিগরী অনেক সময় লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু এই ঘন সবুজ বর্ণের নানা আভায়, শিল্পী তাহার মূর্ত্তিকে নূতন রসে অভিষিক্ত করিতে পারেন। বহু পুরাতন ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি কার্ব্বলিক এসিড ও oxygenর প্রভাবে (oxidation) এমন একটী সুমিষ্ট মধুর সবুজ বর্ণের আবরণে নিমজ্জিত হয়, চিত্রামোদীর পক্ষে এই বর্ণটী (patina) বড়ই আকর্ষণের সামগ্রী।

—সতেরো —

ভারতে ব্রোঞ্জের পরিবর্তে পঞ্চলৌহ এবং অষ্টধাতুর মূর্তির প্রচলন বহুযুগ হইতে প্রচলিত আছে। মহেঞ্জোডারোর প্রাচীন ক্ষেত্রে ধাতুর নর্তকী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দক্ষিণ দেশে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপে কয়েকটী পঞ্চলৌহের সুন্দর বৌদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগের নালন্দার পঞ্চলৌহের মূর্তি এবং দক্ষিণের চোলযুগের অনেক শ্রেষ্ঠ প্রতিমা ভারতবর্ষের ধাতুশিল্পীদের অদ্ভুত নৈপুণ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

স্থাপত্য বা বাস্তু-শিল্প।

(ARCHITECTURE)

যে কোনও বস্তু পৃথিবীর সমতল ভূমির উপর মাথা তুলিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (gravitation) সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। মাধ্যাকর্ষণ সমস্ত বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভূমিসাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইমারতের ছাদকে তাহার অবলম্বন বা ভিত্তি তাহাকে পতন হইতে রক্ষণ করিতে চেষ্টা করে (চিত্র নং ১)। কোনও নির্ম্মিত গৃহ দেখিলে বোধ হয় যে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান আছে, 'স্থাপিত' হইয়া আছে। এই স্থির ভাব, এই 'স্থাপত্যের' ভাব বস্তুতঃ স্থির ভাব নহে—দুইটী বিপরীত শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের মূর্ত্তি। উপরের ছাত নীচে পড়িতে চাহিতেছে—ভিত্তি তাহাকে উপরে তুলিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, এই দুই বিভিন্নমুখী বিপরীত শক্তি পরস্পর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া (neutralize) স্থিরতার মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। এই এক শক্তি অন্য শক্তি দ্বারা জয়ের প্রকাশমূর্ত্তি হল 'স্থাপত্য' (Architecture)। বাস্তুশিল্পের প্রথম সমস্যা এই মাধ্যাকর্ষণকে জয় করিয়া উপরের বস্তুর ভার বহন করা। ["The conflict between gravity and rigidity is the whole aesthetic material of Architecture." Schopenhauer.] যাহার আবরণে জল, বৃষ্টি, আতপ ও বায়ুর আক্রমণ হইতে মানুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহাকে গৃহ, বা আবাস, বা আলয় বলে। গৃহ, বা আবাসমাত্রই স্থাপত্য নহে। যে গৃহের বাহিরের

রূপে তাহার স্তম্ভে, পঞ্জরে, বা খিলানে ভার বহন কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতেছে এই ভাবের প্রকাশ আছে, তাহাকে "স্থাপত্য" বলে। "স্থাপনা" সুসিদ্ধ হইলে এবং সেই সুসিদ্ধির ভাব তাহার বাহ্য আকৃতিতে, তাহার মুখে, ও অবয়বে পরিস্ফুট হইলেই তাহা শিল্প-কলার অন্তর্গত হয়। অন্যথা নহে। [Architecture is the clear expression of an effective structural function.] গ্রন্থীবন্ধন ও ভারবাহন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে এই ভাবের প্রকাশে, গৃহ নির্ম্মাণব্যাপার গৃহনির্ম্মাণ শিল্পের মান্য দাবী করিতে পারে। এই ভার বহনে সক্ষম গঠনপ্রণালীর কৌশল স্থাপত্যের মূল কথা।

ভারতের অতি প্রাচীন আদীম নিবাসী বর্ব্বর টোডা জাতি বাঁশ ও গাছের পাতার উপাদানে ঝড় বৃষ্টির আঘাত সহ্য করিতে পারে এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করে। এই গৃহের আকৃতি ঢালু ছাতের আবরণের ত্রিকোণ ভুজ (চিত্র নং ২)। জল যে এই ত্রিকোণ ভুজের ঢালু ছাতের গা বহিয়া অক্লেশে গড়াইয়া চলিয়া যাইতে পারে এই সম্ভাবনার ভাবটা তাহার ত্রিকোণরূপে অক্লেশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং স্থাপত্য-কলার মধ্যে টোডার তৃণনির্ম্মিত আবাস সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছে। (চিত্র নং ৩)।

বাঙ্গলা দেশের গোলপাতার অষ্ট ছাত ("চাল") যুক্ত "আটচালা" স্থাপত্যের শিল্পকলার মধ্যেও পড়ে (চিত্র নং ৪)। কারণ ইহার বাহিক আকারে ইহার ঝড়বৃষ্টি ও আতপ নিবারণের শক্তি স্পষ্ট-রূপে প্রকট হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণের অনেক বাহ্যরূপ, তাহার গঠনরীতির তাগিদে (necessity of construction) বিশিষ্ট মূর্ত্তি গ্রহণ করে। ঢালু ছাদের চালা না বাঁধিলে, জলের পথ নিবারণ করা শক্ত, এইরূপে ঢালু ছাদের "আটচালা" একটা প্রয়োজনের গরজে বিশিষ্ট আকৃতি পাইয়াছে। ক্রমশঃ এই ঢালু ছাতের গোয়াল পাতার মেটে ঘরকে (চিত্র নং ৫) আদর্শ করিয়া আমাদের বাঙ্গলা দেশের মন্দিরের বিশিষ্ট রূপ উদ্ভূত হইয়াছে (চিত্র নং ৬)।

—ছুটি—

১
২
৩
৪
৬
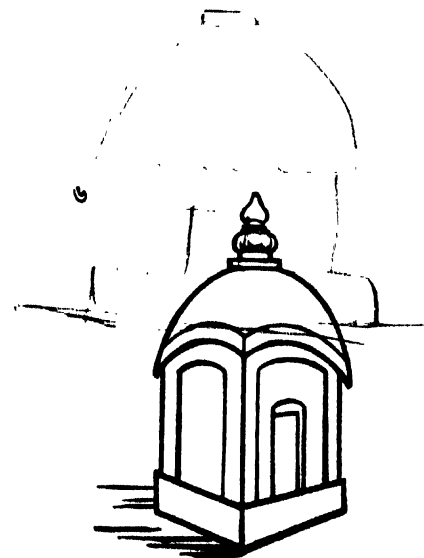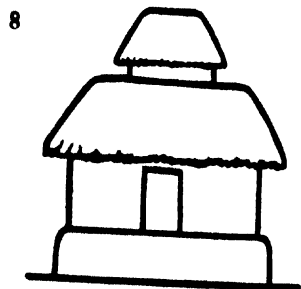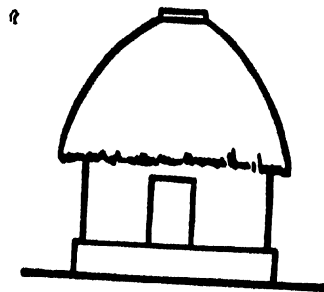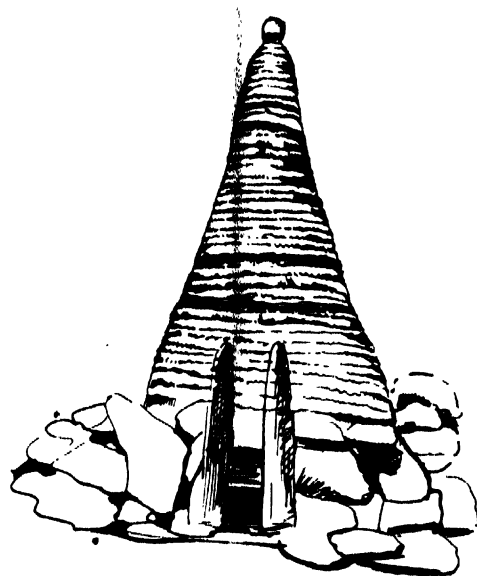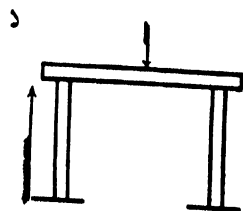
বাঁশ ও গাছের পাতার উপাদান ছাড়িয়া, যখন ভারী পাথরের গৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যক হইল, তখন ঢালু ছাত অন্য কৌশলে সম্পন্ন করিতে হইল। ছোট ছোট পাথরের টালি ক্রমশঃ পরস্পরের সামনে আগাইয়া বসাইয়া উপরের ছাদের অবকাশ যত সম্ভব ছোট করিয়া তাহার উপর শেষ একখানি টালি ফেলিয়া ছাদ সম্পূর্ণ করা হইল (চিত্র নং ৭)। এই পদ্ধতির ছাদ নির্ম্মাণ উড়িষ্যার অনেক মন্দিরে দেখা যায়। এই অবস্থা খিলান (arch) নির্ম্মাণের আগের অবস্থা।

আতপ ও বৃষ্টি নিবারণের পর বাস্তুশিল্পের দ্বিতীয় সমস্যা হল—বায়ু ও আলোক প্রবেশের জন্য জানালা এবং প্রবেশের পথের জন্য দ্বারের ব্যবস্থা। এই দ্বার ও গবাক্ষের জন্য ভিত্তির মধ্যে নানা প্রকারের খোলা পথের অবকাশ বা ছিদ্রের আবশ্যক (চিত্র নং ৭-ক)। কিন্তু এই ছিদ্র বা পথ দেয়ালের মধ্যে খালি রাখিলেই উপরের ইমারতের ভার এই ছিদ্রের (opening) উপর ভিড় করিয়া আসে এবং দেওয়াল বা ভিত্তি পতনোন্মুখ হয় (চিত্র নং ৮)। এই বিপদ হইতে রক্ষার জন্য কেহ কেহ জানালা বা দরজার মাথা সরাসরি পাথরের অবলম্বন (lintel) সংযোগ করিয়া, উপরের ভার দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, পতনের গতি-রোধের ব্যবস্থা করেন (চিত্র নং ৯)। কেহ কেহ খিলানের ব্যবস্থা করিয়া এবং খিলানের রেখার উপর পাশাপাশি ইট সাজাইয়া উপরের ভার কেন্দ্র নানা ইটের উপর বিভক্ত করিয়া দেন (চিত্র নং ১০)। এইরূপে ডিম্বাকৃতি ঢালু রেখা অবলম্বন করিয়া খিলানের (arch) উৎপত্তি (চিত্র নং ১১)। অনেকের বিশ্বাস খিলানের উদ্ভাবনা প্রথমে পশ্চিমদেশের শিল্পীরা করিয়াছিলেন। ভারতে এবং পূর্ব্বদেশের কোন কোন স্থানে খিলানের প্রয়োগ য়ুরোপে প্রচলনের বহু পূর্ব্বে দেখা যায়।

—এক্ষণ—

৭-ক

Lintel
১০
১১
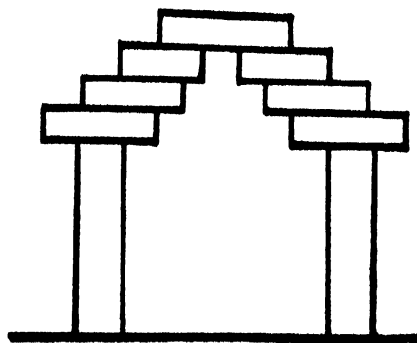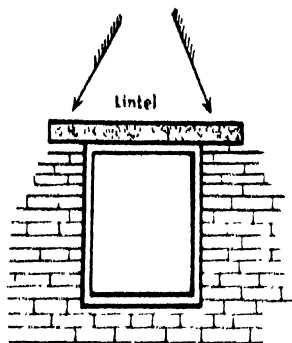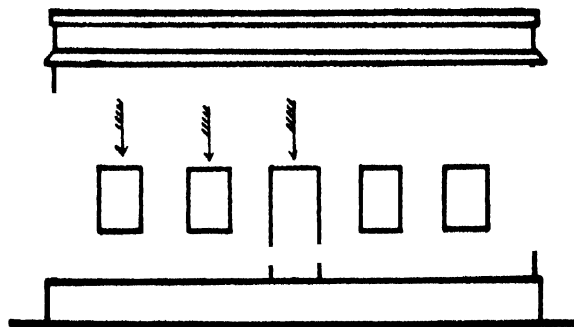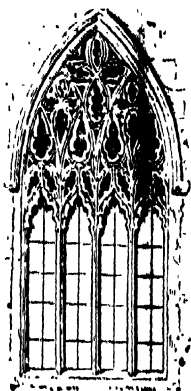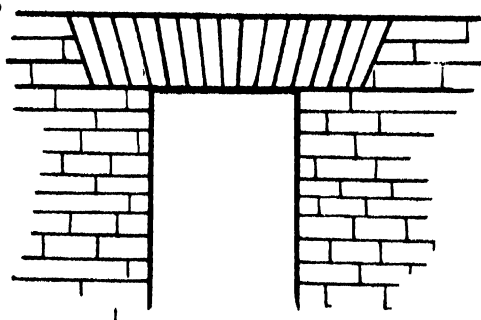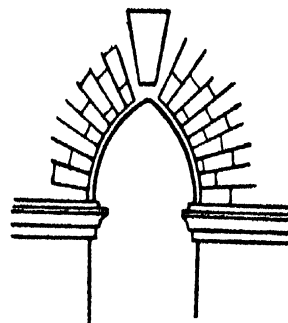
বাস্তুশিল্পে ভিত্তি বা দেওয়াল ছাড়া ভার বহনের আর একটা উপায় হল স্তম্ভ বা থাম (pillar)। বারাণ্ডা বা আলিন্দ রাখতে হলে, থামের আশ্রয় নিতে হয়। এই থাম ভারবহনের উপযুক্ত যথেষ্ট পরিমাণে স্থূল (wide) হওয়া আবশ্যক (চিত্র নং ১১-ক)। অথচ দীর্ঘ ও প্রস্থের মধ্যে একটা দৃশ্য মধুর পরিমাপ (proportion) থাকা আবশ্যক। স্তম্ভের দীর্ঘতা (length) ও স্থূলতা (breadth) এমন মাপের হওয়া আবশ্যক, যাহাতে স্তম্ভটী যে অনায়াসে উপরের অংশের ভার বহন করিতেছে ইমারতটী যে পড়িয়া যাইবার ভয় নাই, এই স্বস্তির (sense of security) ভাবটী তাহার দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে, তাহার আপেক্ষিক পরিমাপে (proportion) পরিস্ফুট হওয়া চাই (চিত্র নং ১১-খ)। এই স্বস্তির অভাব, হীন আদর্শের বাস্তুশিল্পের লক্ষণ (চিত্র নং ১১-গ)। স্তম্ভের যথাযোগ্য দীর্ঘতা ও স্থূলতার উপরে আর একটা সমস্যা হল দুটী স্তম্ভের মধ্যে যথাযোগ্য ব্যবধান (space) (চিত্র নং ১১-ঘ)। এই ব্যবধান (space) ও বাস্তুর বিভিন্ন অঙ্গের যথাযোগ্য পরিমাপের (proportion) উপর বাস্তুরূপের সুদৃশ্যতা নির্ভর করে (চিত্র নং ১২)। ভিত্তি (wall) ও গবাক্ষাদি (opening) এবং স্তম্ভ ও আলম্বনাদি (lintel) প্রভৃতির মধ্যে একটা যথাযোগ্য পরিমাপ (proportion) থাকা আবশ্যক। এবং সৌধটীর নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত সৌধটীকে, তাহার সমগ্র রূপটীকে এক অখণ্ড দৃশ্যমধুর রূপে গড়িয়া তুলিবে (চিত্র নং ১২-ক)। এইজন্য যথাযোগ্য পরিমাপ, (proportion) এক অঙ্গের সঙ্গে অন্য অঙ্গের সম্পর্ক (relation), সৌধের সমগ্র রূপকে অখণ্ড ঐক্যতানে সুনিবদ্ধ করে (চিত্র নং ১২-খ, ১২-গ)। বোধ হয়, এই ঐক্যতানের আদর্শ স্মরণ করিয়া, একজন জার্মান পণ্ডিত বাস্তু-শিল্পকে 'নিশ্চল সঙ্গীতের পিণ্ড' এই সংজ্ঞা দিয়াছেন ("Architecture is frozen music"—Schlegel)। কিন্তু এই সঙ্গীত বা ঐক্যতান কেবল রেখাসমষ্টির বাহ্যিক ঐক্যতা নহে। সৌধের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উপরার্দ্ধ ও নিম্নার্দ্ধের মধ্যে, ভিত্তি ও ছিদ্র ও অবকাশের মধ্যে একটা ভারসাম্যতার (balance) স্থৈর্য্য (equilibrium), বিভিন্ন শক্তি ও গতির সমন্বয়ের বাস্তবিক ঐক্যতা বা যথাযোগ্যতা (propriety) চাক্ষুষ রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে। এই গঠন

১১-ক

১১-খ

১১-গ

১১ ঘ

১২-ক

১২-খ

১২-গ

১২
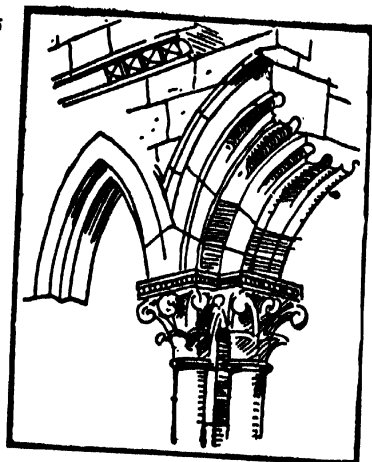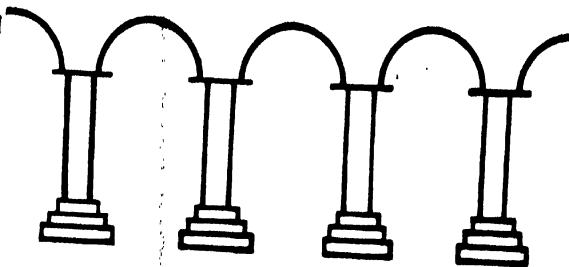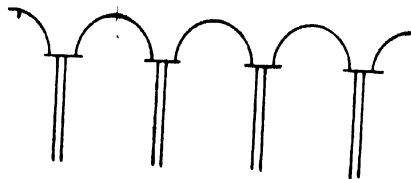
কার্য্যের কুশলতা, এই কাঠামর কার্য্যকারিতা (functional success) ইমারতকে বাস্তুশিল্পের কোটায় উন্নত করে। যথাযোগ্যতা (propriety, fulfilment of purpose) সৌধকে স্বরূপতা, শ্রী, বা সৌন্দর্য্য প্রদান করে। কতকগুলি বাহ্য অলঙ্কার বা ভূষণ জুড়িয়া দিলেই বাস্তু-নির্ম্মাণ 'শিল্পে' পরিণত হয় না। সৌধের মুখপাতে কখনও কখনও অল্প অধিক পরিমাণে অলঙ্কার (ornament) সংযোজনার প্রথা আছে। কিন্তু এই অলঙ্কার যোজনার প্রধান উদ্দেশ্য কাঠামর (structure) আবশ্যকীয় বন্ধনী ও আলম্বনের অত্যাবশ্যকতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, এবং গঠন ও ভারবহনের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে ইঙ্গীত করা (emphasis)। খিলানের দুটী বাঁকা রেখার মধ্যদেশে একটা কীলক (keystone) স্থাপন করা ভারবহনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার (চিত্র নং ১৩)। সুতরাং, এই কীলকের আকৃতি চোখের সামনে ফুটিয়ে রাখতে হয়। এই কীলক অবলম্বন করিয়া ভূষণ বা অলঙ্কারের অবকাশ হয় (চিত্র নং ১৪)। স্তম্ভ যে উপরাংশের ভার বহন করিতেছে তাহা প্রকট করা স্থাপত্যের একান্ত আবশ্যক। এই প্রকাশ করার তাগীদে গ্রীসের পূর্ব্বযুগে স্তম্ভের স্থানে একটী ভারবাহিনী নারীর মূর্ত্তি কল্পিত ও সন্নিবেশিত হইত ইহার নাম ছিল কারিয়াটিড্ (Caryatid) (নারীস্তম্ভ) (চিত্র নং ১৫)। অনেক সময় স্তম্ভের উপর ভার সাম্যের বা যথাযোগ্য ভার বিভাগের জন্য (distribution of weight) স্তম্ভের মস্তকে একটা আলম্বন বা মুকুটের (capital) ব্যবস্থা করিতে হয়। ক্রমে এই স্তম্ভের মুকুট বা থামের মাথা নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্তম্ভটীকে একটী অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য প্রদান করে। নানা বিভিন্ন রীতির স্থাপত্যের স্তম্ভ তাহাদের বিশিষ্ট রীতির মুকুট (capital)', বহন করে তাহার জাতি (order) নির্ণয়ের একটী প্রতাক বা চিহ্ন হইয়া উঠে। যথা, ডোরিক, আইয়োনিক, করিন্থিয়ান (চিত্র নং ১৬)। মুকুটের আর একটা উদ্দেশ্য হ'ল স্তম্ভের vertical রেখা, এবং উপরের আলম্বনের horizontal রেখার বৈপরীত্যের উগ্রতা হ্রাস করা। রেখার এক মুখ হইতে অন্য মুখে গতির সাহায্য করা। (চিত্র নং ১৬-ক)।

১৩
key-stone
১৫
১৪
১৬
১৬-ক
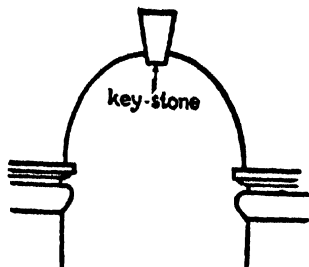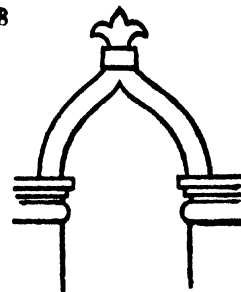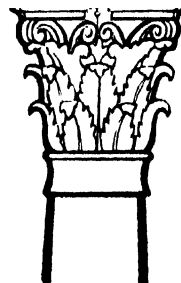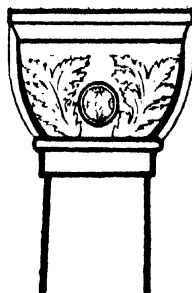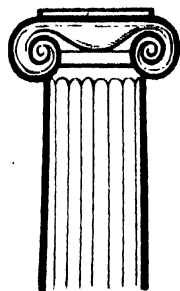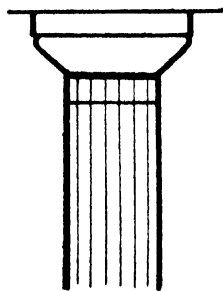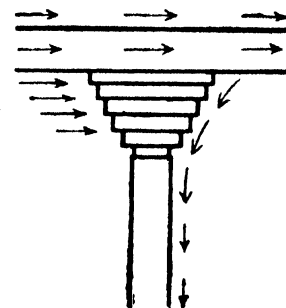
স্তম্ভের মাথায় যেমন মুকুট থাকে, তার পাদ-দেশে থাকে পাদপীঠ (base)। পাদপীঠ যেন একটা সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ। এই পাদপীঠের প্রথম সূচনা হয় আবশ্যকের তাগীদে। প্রস্তরশিল্পের পূর্ব্বে, যখন কাঠ বা বাঁশের দণ্ড দিয়ে স্তম্ভ নির্ম্মাণ হত, তখন কীটের দংশনে বা আঘাতে স্তম্ভটী জীর্ণ না হয় তাহার রক্ষার জন্য জলপূর্ণ কলসের মধ্যে বংশটী সুরক্ষিত হইত (চিত্র নং ১৭, ১৭-ক)। যখন পাথর ও কাষ্ঠ বাঁশের স্থান লইল, তখন পূর্ব্বযুগের কলসের রূপটী স্তম্ভের পাদপীঠে রহিয়া গেল (চিত্র নং ১৮)। পশ্চিমদেশে কার্লির গুহামন্দিরে, পাথরে কাটা কলসের আকৃতি স্তম্ভের পাদভূষণ (চিত্র নং ১৯)। স্তম্ভ ও খিলানের সাহায্যে সৌধ যখন মাথা তুলে দাঁড়াল, তখন তাহার ছাদের উপর আচ্ছাদনের সম্পূর্ণতার প্রমাণরূপে মুণ্ড বা শিখর বসাবার প্রয়োজন হয়। এটা যেন একটা উপর দিকের কার্য্য-সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ। অনেক যুগ ধরে ঢালু ছাদের ত্রিকোণভুজ দিয়ে শিখরদেশের রূপ কল্পিত হয়। তাহার পর এল সোজা সরল রেখা, তাহার শেষ ভাগ ঈষৎ বক্র করে তাহার স্কন্ধের উপর চড়লো—পাগড়ীর মত একটী 'অমলক শিলা' যেমন ভুবনেশ্বরের মন্দিরে (চিত্র নং ২০)। ক্রমশঃ, স্থাপত্যশিল্পীরা গোলাকৃতি গম্বুজের সৃষ্টি করলেন। (চিত্র নং ২১) এই গোলাকৃতি শিখর কখনও হল অণ্ডের মত, পদ্মের মত, কখনও হল চক্রের মত সমভুজ। (চিত্র নং ২২)।

এই গম্বুজের শিখর পূর্ব্বদেশে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। পরে Crusade যুগের পর, য়ুরোপে গম্বুজের প্রচলন হয়। গম্বুজের গোলাকৃতি স্থাপত্যশিল্পের সরল রেখার উপর এক নূতন রসের বাঁকা রেখার উপাদান সংযুক্ত করিয়াছে।

গম্বুজের পরিবর্ত্তে য়ুরোপের স্থাপত্যে ক্ষুদ্রকায়ের এক প্রকার শিখরমন্দির (Tower) প্রচলিত ছিল। এই শিখরমন্দিরের যথাযোগ্য প্রয়োগে, সরল রেখার horizontal কাঠামোর উপর একটা অভ্রভেদী শৃঙ্গের ব্যবস্থা করিয়া বৈচিত্রের সমাবেশ করিয়াছে। গথিক যুগের গির্জ্জায় এই অভ্রভেদী শৃঙ্গের (tower, minaret) প্রয়োগ, ভক্তের ও উপাসকের উত্তোলিত হস্তের পরিকল্পনায় খৃষ্টানী স্থাপত্যরীতিকে বিচিত্র ও দিব্যসৌন্দর্য্যে দীপ্যমান করিয়া রাখিয়াছে (চিত্র নং ২৩)।

১৭
১৮
১৯
১৭-ক
২০
২১
২২
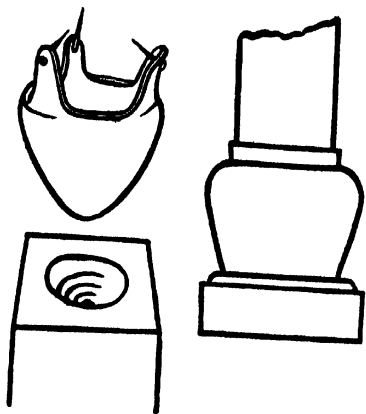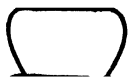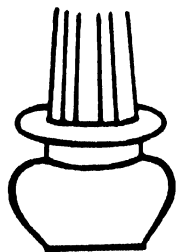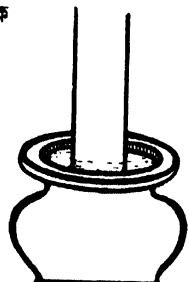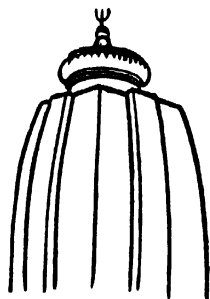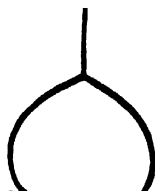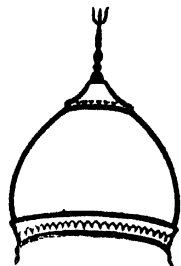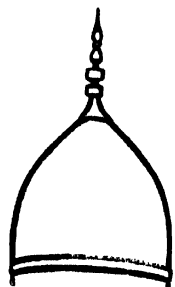
এই গথিক গির্জ্জার শিখরমন্দিরের অনুরূপ আকৃতির অলঙ্কার মুসলমানী রীতির 'মিনার'। গোল গম্বুজের পাশে দীর্ঘ আকৃতির 'মিনার' মুসলমান স্থাপত্যকে অভিনব ও বিচিত্র শোভায় ভূষিত করিয়াছে (চিত্র নং ২৪)।

কনষ্টান্টিনোপলের সান্টা সোপিয়ার গির্জ্জা, কাইরোর কাইৎবের সমাধি, ইসপাহানের বাদশাহী মসজিদ এবং আগ্রার তাজমহলে, গম্বুজ ও মিনার গোল ও সরল রেখার বৈপরীত্যের সুমধুর রস সুকৌশলে বিচিত্র রেখার ছন্দে প্রকাশ করিয়াছে।

স্থাপত্যের রচিত সৌধ অনেকটা ভাস্কর্য্যের অনুরূপ আকাশ জুড়িয়া অবস্থান করে এবং আপনার ছায়ার রেখারূপ (sky-line) আকাশের পটভূমিকায় (back-ground) চিত্রিত করে। সৌধের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খুটিনাটীর শোভা বিচার করিবার পূর্ব্বে, আকাশের গায়ে তাহার সমগ্র মূর্ত্তি (Silhouette) এক আকৃতি গ্রহণ করিয়া ভাসিয়া উঠে, তাহার বিচার আগে করিতে হয়। এইজন্য বিচক্ষণ স্থপতি এই আকাশের রেখারূপে (skyline) তাহার রচিত সৌধের প্রতিমূর্ত্তি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। দূর হইতে এই আকাশে লিখিত রেখা-রূপ আগে আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠে। সৌধ বা মন্দিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভূষণ ও খুটিনাটী নিকটে না আসিলে চোখে ঠেকে না। মানুষের নগ্নদেহ যেমন বস্ত্র ও অলঙ্কারের ভূষণে আবৃত হয়, সৌধের মুখপাত (Facade) ও তাহার বক্ষঃস্থল, জঙ্ঘা ও পাদদেশ তাহার গঠনের নানা কাঠামর বন্ধনীর রেখা অনুসরণ করিয়া ভূষণ ও অলঙ্কার দ্বারা প্রস্ফুটিত ও দীপ্যমান করিবার প্রথা আছে (চিত্র নং ২৪-ক, ২৪-খ, ২৪-গ)। এই অলঙ্করণ বিশেষ বিচার করিয়া রুচি (taste) ও পরিমাণের (proportion) সম্মান রাখিয়া, নিয়োজিত করিতে হয়। অতিমাত্রায় ভূষণ সংযুক্ত করিলে, সৌধের মুখপাত (facade) ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। অতি অল্প ভূষণের সৌধের দেহ, নগ্নতা ও দীনতায় শুষ্ক হইয়া উঠে। এই ভূষণ যোজনার নানা বিভিন্ন রীতি ও পদ্ধতি আছে। কেহ লতাপাতা বা জ্যামিতির আকৃতির ভূষণে সৌধ অলঙ্কৃত

২৩

৪
ক

২৪-গ

২৪

১৪-খ
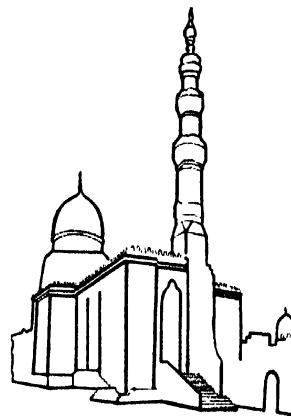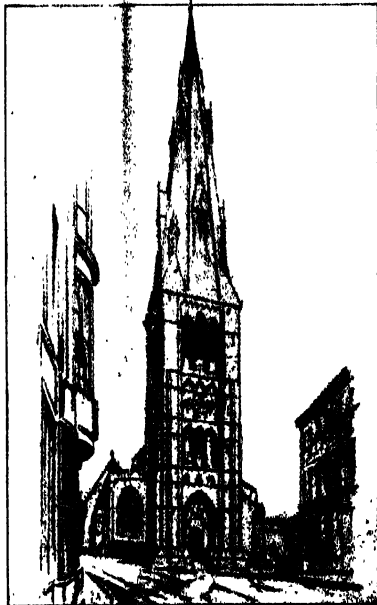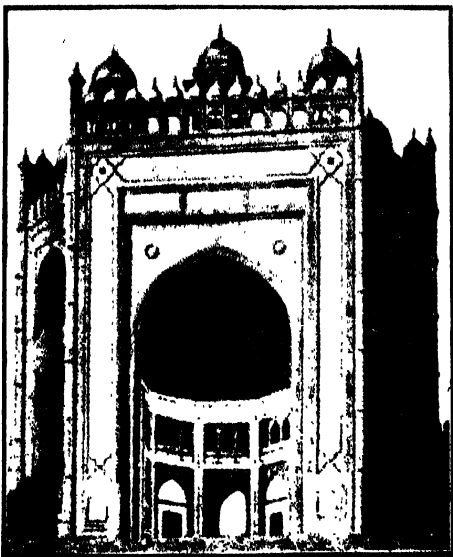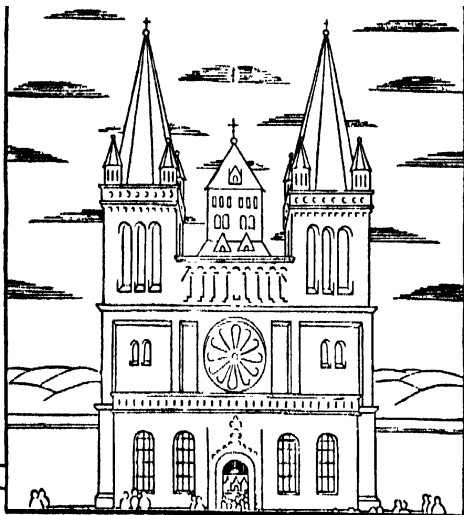
করেন। কেহ সাধু-সন্ন্যাসী, ঋষি, বা 'আবরণ'-দেবতার প্রতিমাদি সংযোজিত করিয়া মন্দিরের দেহ অলৌকিক সজ্জায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলেন। ফ্রান্সের আমীয়েন্স, নোত্‌র দাম্, রাওয়েন, প্রভৃতি গির্জ্জার বক্ষ ও পাদদেশ অসংখ্য সাধু, সন্ন্যাসী, দানপতি, ও ভক্তগণের উজ্জ্বল প্রতিমায় ভূষিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের ও দক্ষিণদেশের কয়েকটী মন্দিরে ইহার অনুরূপ ভাস্কর-শিল্পের অলঙ্কার আছে। মন্দিরের, বা গৃহের গাত্রদেশ নগ্ন বা আভরণ শূন্য করিলে, আলো ও ছায়াপাতের বিচিত্র রস উপভোগের সুযোগ ঘটে না (চিত্র নং ২৫)। উচ্চ অঙ্গের স্থাপত্যে তাহার সমতল পৃষ্ঠদেশ ও পার্শ্বদেশ ভূষণের সংযোগে উচ্চ ও নিম্নক্ষেত্রের লহরী-মালার অবকাশে আলো ও ছায়ার ছন্দলীলার যে সুযোগ ঘটে নিরাভরণ সমতল (plane) ক্ষেত্রে তাহার আস্বাদ পাওয়া যায় না (চিত্র নং ২৬)। এইজন্য যেখানে ভূষণ কিম্বা প্রতিমা সংযোজনার অবকাশ নাই, সেখানে সুদক্ষ স্থপতি (Architect) সৌধের মুখপাত (facade) ও সমতল ক্ষেত্রে নানা উঁচু নিচুর খাল কাটিয়া বিভাগ রচনা করিয়া (breaking the area) মুখপাতের ক্ষেত্র কতক সম্মুখে, কতক পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়া, নানা বিচিত্র পদ্ধতি ও অনুপাতের ছায়াপাতের (shadow) সম্ভাবনার সৃষ্টি করিয়া দেন (চিত্র নং ২৭)। এই ক্ষেত্র-বিভাগে (division of space) ও আলো ও ছায়ার তারতম্যে ও ভূষণের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সৌধের অবয়ব চক্ষুর তৃপ্তিকর রমণীয় রূপে প্রকাশিত হয়। (চিত্র নং ২৮)।

অনেকে মনে করেন বাস্তু-শিল্প একটা প্রয়োজনের শিল্প (Utilitarian Art)। ইহাতে রস পরিবেশণের কোনও সুযোগ নাই।

সৌধ-শিল্পে ভার (weight) ও মাধ্যাকর্ষণের (gravitation) শক্তিকে পরাভূত করিতে পারে, এইরূপ কার্য্যক্ষম উপযুক্ত কাঠামো প্রস্তুত করিবার উপর, এই মুখপাতের উপর, আলো ও ছায়ার লীলাক্ষেত্রে, শিল্পীরা একটা অতিরিক্ত রসের পরিবেশণের ব্যবস্থা করেন। এই আলো ও ছায়ার রসরূপ, কাঠামো বাঁধার কোনও কেজো অংশ নহে। এটা শিল্পীর অতিরিক্ত

২৫

২৬

২৭

২৮
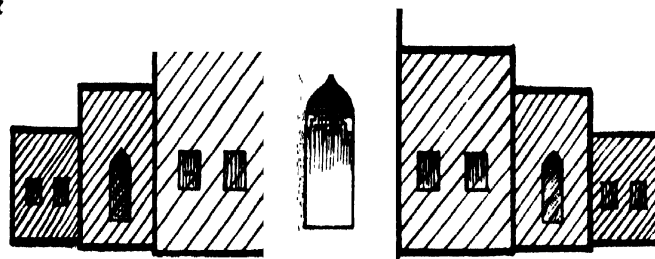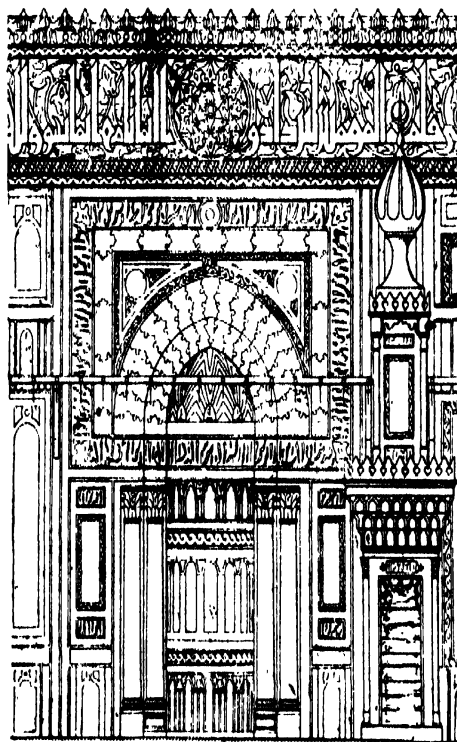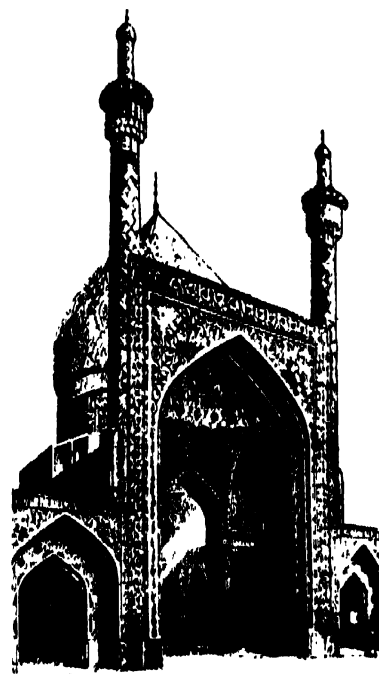
দান। ইহার উদ্দেশ্য সৌধরচনাকে আলো ও ছায়ার আকর্ষণ দিয়ে চিত্তহারী করে তোলা। এই মুখপাতের আলো ছায়ার লীলাক্ষেত্রে, শিল্পী নানা বিভিন্ন রসের অবতারণা করিতে পারেন। গাম্ভীর্য্য, জয়োল্লাসের গর্ব্ব, ভক্তির উচ্ছাস, শোকের বিনয়-নম্র রূপ ইত্যাদি। নানা উদ্দেশ্যের কীর্ত্তি-সৌধে (monument) নানা বিভিন্ন রসের প্রকাশ করিবার সাধন বা শব্দমালা স্থপতির অভিধানে আছে। কিন্তু এই রসের প্রকাশ স্থপতিশিল্পে বাস্তব রীতিতে সম্ভব নহে। ইহার প্রকাশ হয় সঙ্কেতের ভাষায়, প্রতীকরূপের (symbol) অস্পষ্ট আবছায়া কথায়। খৃষ্টানের গীর্জ্জা তাহার শিরোদেশের দুই পাশে কথন নাতিদীর্ঘ কথন অতি দীর্ঘ শিখরমন্দিরের (Tower) দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, ভক্তের আরাধনার ভঙ্গীতে আকাশে উত্তোলন করিয়া আছে (চিত্র নং ২৯)। ইসলামের মসজিদ তাহার মিনারের ছদ্মরূপে এক হস্তের বিশাল বাহু একেশ্বর জগদীশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেছে (চিত্র নং ২৪)। বৌদ্ধযুগের চৈত্যকারী ভক্ত বুদ্ধদেবের অস্থির পবিত্র অবশেষ অতি আয়াসে সংগ্রহ করিয়া তাহার ধাতুগর্ভ গোলাকৃতি চৈত্যের মধ্যে সংগোপনে লুক্কায়িত রাখিয়া যেন রত্নাধারের উপর বক্র রেখায় অবনমিত হইয়া দিবারাত্রি নিদ্রাহীন নিষ্পলক নেত্রে সংরক্ষণ করিতেছে। (চিত্র নং ৩০)।

যবদ্বীপের বরোবুদারের মন্দির, সমাধি মগ্ন বোধিসত্ত্বের ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া, নির্ব্বাক আরাধনার প্রতীকরূপে বজ্রাসনের নিশ্চল আসনে বসিয়া আছে। (চিত্র নং ৩১)।

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গেশ্বরের মন্দির শিবের চাক্ষুষ প্রতীকরূপে, ঈষৎ বক্র রেখায় পরিসমাপ্ত সরল রেখার কঠিন গাম্ভীর্য্যে ও ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের চাক্ষুষ প্রতিমারূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। (চিত্র নং ৩২)।

স্থাপত্য-শিল্প (Architecture) অন্য সমস্ত শিল্পের জননী। গৃহ নির্ম্মাণ না হইলে চিত্র লিখিবার আবশ্যকতা হয় না। গৃহের ভিত্তিতে সর্ব্ব প্রথম মানুষ চিত্র লিখিতে আরম্ভ করে। ভিত্তির ভূষণরূপে (decoration) চিত্রের জন্ম হইয়াছে। গৃহভিত্তি না পাইলে

২৯

৩০

৩১
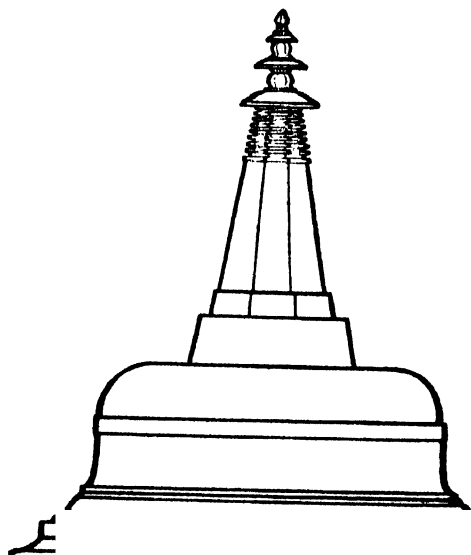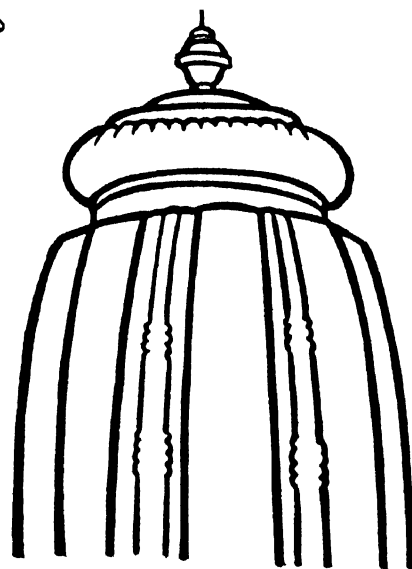
ফলকচিত্র লম্বিত করিবার স্থান পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্র পর্ব্বতগুহার (cave) ভিত্তিতে চিত্রিত হইয়াছিল [যেমন পিরীনিজ্ পর্ব্বতের আল্তামিরা গুহার আদিম মানুষের চিত্র]। এইরূপে, খৃষ্টানযুগের প্রথমচিত্র মাটীর নীচে গুপ্তগৃহের (catacombs) ভিত্তিতে চিত্রিত হয়। ইতালীর শ্রেষ্ঠ চিত্রমালা—গীর্জ্জার ভিত্তির ভূষণরূপে, ভক্ত ও উপাসকগণের ভক্তিরসের উপাদানরূপে চিত্রিত হয়। এইজন্য ভিত্তিচিত্র (fresco-painting) চিত্রকলার প্রথম রূপ। ভারতবর্ষেও (আদীম যুগের চিত্রাবলীর পর) অজন্তাগুহার ভিত্তিচিত্র (fresco-painting) সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্র।

মানুষের হাতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রতিমা (Sculpture) স্থাপত্যের সহিত জড়িত। দেবতার মূর্ত্তির রক্ষাগৃহ হল' মন্দির, দেউল, ও গীর্জ্জা। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে মূর্ত্তির স্থান। মূর্ত্তি-শিল্প স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে মন্দির, সৌধ ও অন্যান্য কীর্ত্তি সৌধের (monument) সহিত সংলগ্ন ছিল। মূর্ত্তি-শিল্প প্রথম অবস্থায় স্থাপত্যের সহিত যুক্ত (architectural sculpture) ছিল। স্থাপত্যের অলঙ্কার হিসাবে, মূর্ত্তিশিল্প আদিযুগে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইজন্য অনেক সময় আকৃতি ও প্রকৃতিতে, পরিমাপে ও কল্পনায়, ভাস্কর্য্য স্থপতি-শিল্পের প্রয়োজনীয়তার বশীভূত হইয়া চলিয়াছে। তাহার নিজের সত্ত্বা স্থাপত্যের দাবীতে খর্ব্ব হইয়াছে। মন্দিরে সংলগ্ন নানা ভাস্কর্য্যপ্রতিমায় তাহার নানা প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। যতদিন ভাস্কর্য্য স্থাপত্যে সংলগ্ন ছিল, ততদিন চৌমুখ অর্থাৎ চতুর্দ্দিক হইতে দ্রষ্টব্য পরিপূর্ণ মূর্ত্তি কল্পনার অবকাশ ছিল না। কেবল মন্দিরের প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত মূর্ত্তি সম্মুখ হইতেই দর্শনীয় ছিল। এই অবস্থায় ভাস্কর্য্যের স্বাতন্ত্র্য ছিল না, সৌধ বা মন্দিরের অংশবিশেষের অলঙ্কার হিসাবেই ভাস্কর্য্যের মূল্য বিচার হইত। এমন কি, রাজা, মহাপুরুষ, সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতিমূর্ত্তি (portrait) পর্য্যন্ত কীর্ত্তি-সৌধ (monument) বা সমাধির স্থাপত্যের সহিত সংযুক্ত করিবার রীতি ছিল। প্রাচীন আসীরিয়ার শিল্পে, গ্রীসদেশের শিল্পে, এবং গথিকযুগের শিল্পে

প্রতিমাশিল্পের স্থাপত্যশিল্পের অধীনতার অনেক প্রমাণ আছে। মানুষের নিত্য ব্যবহারের কারুশিল্পজাত নানা বস্তু, সৌধ ও বাস্তুশিল্পের উপর নির্ভর করিয়া আছে। ঘরের আসবাব-পত্র, খাট, আসন, মাদুর, গালিচা, ঘটী, বাটী, তৈজসপাত্র গৃহবাসের ও গৃহসজ্জার সম্ভার ও উপকরণ বাস্তুশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট। গৃহ না থাকিলে, গৃহসজ্জার ও গৃহবাসের আসবাব উপকরণের কোনও আবশ্যকতা ও মূল্য নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কলাশিল্প (painting and sculpture) ও কারুশিল্প (Applied and Industrial Art) এই দুই জাতির শিল্পই স্থাপত্যশিল্পের ছায়ায় জীবিত থাকে। ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

স্থাপত্যশিল্পের আর একটা বিশেষত্ব এই, যে এই শিল্প মানুষের সমাজ ও সামাজিক জীবনের সহিত নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ। উৎসবগৃহ, উৎসবমণ্ডপ, সভাগৃহ, সভামণ্ডপ, নাট্যশালা, নাট্যমণ্ডপ প্রভৃতি নানাজাতির স্থাপত্য বহু মানুষের মিলন ও একত্রে সমাগমের আচ্ছাদন রচনা করে। তাহা ছাড়া এক একটী গৃহ বা বাস্তু একাধিক মানুষ ও তাহাদের পুত্রকন্যা ও আত্মীয়গণের একত্র বসবাসের নিলয়ভূমি। স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া এক একটী গৃহবাস নির্ম্মিত হয়—"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"। এক একটী গৃহে, এক একটী পরিবার নিবাস করিয়া, সমাজের এক একটী উপকরণ (unit) যোগাইয়া দেয়। এই নানা পরিবারের সমষ্টির সমাহারে সমাজ গঠিত হয়। কয়েকটী পর্ণ কুটীরের সমষ্টিতে এক একটী গণ্ডগ্রাম। নানা বাস্তুগৃহের সমাহারে সহরের জন্ম। গ্রামের কুটীর হইতে সহরের সৌধমালা স্থপতিশিল্পী বা বাস্তুশিল্পীর উপর নির্ভর করে। বাস্তুশিল্প বাদ দিয়া সমাজ টিকিতে পারে না। কি গ্রামে, কি সহরে, মানুষের সামাজিক জীবনের অভ্যাস (habit) ও রীতি পদ্ধতি (mode of life) অনুসারে, বাস্তুশিল্পের কাঠাম ও রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। যে কোনও মানুষের গোষ্ঠী (community) যেমন ধারায়

জীবন যাপন করে, তাহার বাস্তুশিল্প তাহার প্রয়োজনীয়তা ও রুচি অনুসারে রূপ ও মূর্ত্তি গ্রহণ করে। এইরূপে মানুষের জীবনের প্রতিকৃতি বা প্রতিবিম্ব তাহার গৃহবাসের রূপে (form) ও নক্সাতে (design) প্রতিফলিত হয়। বাঙ্গলাদেশের জীবনযাপনের প্রথা ও রীতি নীতি বাঙ্গালীর গৃহের, দালান, দরদালান, ঠাকুরঘর, উঠান, চক-মিলান বারান্দা, শয়নগৃহ, গোশালা ও স্নান গৃহের ব্যবস্থা ও সংস্থানরীতিতে (plan) প্রতিফলিত হইয়া আছে। গত ২৫।৩০ বৎসরে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের রীতিপদ্ধতিতে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন তাহার আধুনিক গৃহের ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হইতেছে। এইরূপে মানুষের জীবনের আদর্শ, তাহার জীবনগঠনের রীতি ও পদ্ধতি তাহার বাসগৃহ নির্ম্মাণের রূপে ও ব্যবস্থায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। অনেকে বলেন যে বাসগৃহের রূপ ও ব্যবস্থা মানুষের সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। কোনও কোনও রীতির গৃহ তাহার সমাজবুদ্ধিকে, তাহার নীতি-বুদ্ধিকে পীড়িত ও সঙ্কুচিত করে। যদি আমরা বৃহৎ আদর্শের সামাজিক জীবন, উচ্চ আদর্শের নৈতিক জীবনের অভিলাষী হই, আমাদের তাহার উপযোগী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কারণ, আমাদের বাস-গৃহের ব্যবস্থা ও স্থাপনা আমাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনের পথ প্রদর্শক হয়। আমাদের এমন গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক, যে গৃহে আমাদের সামাজিক বুদ্ধি, নীতিবুদ্ধি, ধর্ম্মবুদ্ধি, সৌন্দর্য্যবুদ্ধি, স্বাস্থ্যবুদ্ধি, এক কথায় আমাদের সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের বিকাশ ও প্রসার সহজে সম্পন্ন হইতে পারে।

য়ুরোপের আধুনিক যুগে তাহার নূতন জীবনের আদর্শের অনুকূল ও আধুনিক সামাজিক (social) ও চিন্তাধারার (intellectual) অনুরূপ স্থাপত্যের উদ্ভব হইয়াছে। এই আধুনিক পদ্ধতির গৃহনির্ম্মাণবিধি প্রধানতঃ তিনটী কারণে জন্মলাভ করিয়াছে—বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবুদ্ধি অর্থনীতির তাগীদ, ও গৃহনির্ম্মাণের নূতন উপকরণের (material) সৃষ্টি। প্রথমতঃ সহজে গৃহের

সমস্ত কোণ ও অংশ শীঘ্র পরিষ্কার রাখিবার প্রয়োজনে, স্থাপত্যে সমস্ত প্রকারের ভূষণ ও জটিলতা নির্ব্বাসিত হইয়াছে। অলঙ্কারবহুল গৃহ (ornamental architecture) ধূলা ও রোগের বীজ ও বীজাণুর (germ) আবাসভূমি হয়। গোলাকৃতি খিলানের নানা স্থানে, ঘরের কোণে, অলঙ্কারের পাটে পাটে, নানা জঞ্জাল ও রোগের বীজ জমা হইয়া উঠে। অধিকতর আলো ও বায়ুসঞ্চালনের জন্য বড় বড় চতুষ্কোণ অবকাশ রাখিয়া প্রাচীন প্রথা ও পরিমাপের জানালা তিরোহিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিশ্বাসের নানা প্রতীক (symbol) ও প্রতিমা বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং প্রাচীনকালের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতীকরূপে (symbol) যে সমস্ত ভূষণ ও অলঙ্কার পূর্ব্বকালের গৃহের নানা স্থানে অধিকার করিয়া থাকিত, সেগুলি সমূলে উৎপাটিত ও নিষ্কাসিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান আদর্শের জীবন-যাত্রার পদ্ধতিতে, এবং অর্থনীতির তাড়নায় আত্মীয়স্বজনের সহিত এক গৃহে বাস করা অসম্ভব হইয়াছে। অল্প খরচের, অল্প পরিসরের, ভূষণবর্জ্জিত, সরল রেখায় কল্পিত (straight line) প্রচুর বায়ু ও আলোকযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণের আদর্শ নূতনরীতির স্থাপত্যের জন্ম দিয়াছে। এই স্থাপত্যের নাম হল চতুষ্কোণবাদী (cubistic) বাস্তুরীতি। ইহাতে বাঁকা রেখার কোনও স্থান নাই। সরল রেখার সমাহারে ইহা নির্ম্মিত। জীবনকে জটীলতা বর্জ্জিত করিয়া, সহজ পথে, সরল পথে, স্বাস্থ্যের পথে, বিজ্ঞানসম্মত পথে, অল্প খরচের পথে, পরিচালনা করা এই নূতন রীতির স্থাপত্যের মূল সূত্র। এই পদ্ধতির বাস্তুশিল্প প্রাচীন ধারার স্থাপত্য রীতির সহিত সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন করিয়াছে। কতকটা আদীম যুগের বাঁশ ও কাষ্ঠের তৈরী সহজ সরল স্থাপত্য-রীতির অকৃত্রিমতার রূপে ফিরিয়া যাইবার লক্ষণ এই আধুনিক রীতিতে লক্ষ্য করা যায়। আদিম জীবনের জটীলতাহীন সরলতার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার একটা দুরাশা ও আকাঙ্খা এই পদ্ধতির মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু জীবনে সরলতা ও সত্যের রূপ

প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে অনাবশ্যক বাবুয়ানা ও ঐশ্বর্য্যের ভোগ-বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে হইবে। য়ুরোপে, নানা কারণে জীবনযাত্রার রীতি পদ্ধতি বেশ-ভূষা ও গৃহের আসবাবপত্র অনাবশ্যক ব্যয়সাধ্য ও জটীল হইয়া উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ আধুনিক রীতির সরল বাস্তু-পদ্ধতি একটা সহজ সরল ভোগ-বিমুখ সংযমী জীবনের আদর্শের দিকে ঈঙ্গিত করিতেছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন পদ্ধতির স্থাপত্যে ভারতের প্রাচীন জীবনের রীতি পদ্ধতি ও আদর্শ সার্থক হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের বাস্তু-শিল্প ভারতের প্রাচীন জীবনের সাধনা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ফল। ভারতের আধুনিক সাধনা ও ভবিষ্যতের সংস্কৃতি ভাবীকালের ভারতের বাস্তুশিল্পকে কোন নূতন পথে, কোন নূতন সৌন্দর্য্যের আদর্শে গঠিত করিবে, আধুনিক ভারতের উপর তাহার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য নিহিত ও ন্যস্ত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যকীর্ত্তি আজও সমস্ত পৃথিবীকে বিস্মিত করিতেছে। ভারতের ভবিষ্যৎ স্থাপত্য-কীর্ত্তি তাহার প্রাচীন কীর্ত্তির সাধনা ও আদর্শকে যে অতিক্রম করিবে না একথা কে বলিতে পারে?

—বোত্রিংশ—

শ্রীমতী সুষমা দাশগুপ্ত